সীতারাম রায়।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণতোষাভিলাষী
[illegible]
[illegible]
শ্রীসীতারাম রায়ের [illegible] ভক্তিভাজন [illegible]

অবতরণিকা।

১৩০২ সনের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত "সাহিত্যে" "সীতারাম" শীর্ষক যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি এল, মহাশয়ের অনুমতিক্রমে, ঐ প্রবন্ধগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সাহিত্যগুরু ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সীতারাম" উপন্যাস। ইতিহাসের সীতারামের কতকগুলি কার্য্যকলাপ অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিক সত্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পান নাই। অক্ষয় বাবুর সীতারাম ইতিহাসমূলক। যথাসম্ভব যত্ন ও চেষ্টা করিয়া সীতারাম রায়ের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের যতদূর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব অক্ষয় বাবু তাহাতে ত্রুটী করেন নাই। বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, তাহার মধ্যে যতটুকু রাখিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করা সঙ্গত, এই উদ্দেশ্যে সীতারাম রায় প্রকাশিত হইল। এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে দেশের ইতিহাস পাঠে ইচ্ছা আছে ইহা জানিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব।

বাণীপ্রেস, রাজসাহী।
১লা বৈশাখ, ১৩০৫ সাল।

শ্রীঅঃকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
প্রকাশক।

রাজসাহী।

বাণীপ্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরিকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সীতারাম রায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রচা কথা!

আমরা বড়ই উপন্যাসপ্রিয়। আমাদের রুচি বুঝিয়া, বঙ্কিমবাবু সীতারামকে লইয়া একখানি বিচিত্র উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। সে উপন্যাসে বঙ্কিমবাবুর সরল সুন্দর তুলিকার বিন্যাসে সীতারামের চিত্র যেরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের অধিকারী মহাশয় বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাইয়াছেন। একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ সন্ধান; সুতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তথাপি উপন্যাসের সীতারামে ইতিহাসের সীতারাম পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার অবসর পায় নাই।

কৃত্রিম ফুল বড়ই সুন্দর;—বর্ণসামঞ্জস্যে, গঠনগৌরবে আসল বলিয়া অনেকেরই ভুল হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি তাহা কৃত্রিম; ঘ্রাণে মধুগন্ধ নাই, স্পর্শে দেবদুর্লভ কোমলতার অভাব। উপন্যাসের নায়ক হইয়া সীতারামের সেই অবস্থা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তাহা নিজেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং বেকসুর খালাস হইবার ভরসায় কবুল জবাব দিয়া গ্রন্থারম্ভেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।"

আদর্শ উপন্যাসলেখক গ্রন্থশেষে দুই জন নাগরিকের মুখ দিয়া আমাদিগকে যাহা শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহা এই —

"রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া। মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ —সে ত জানাই ছিল। গড় টড় সব মুসলমানে দখল করে লুটপাট করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হলো কিছু ঠিক খবর রাখ ?

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদে চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুনতে পাই যে তারা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকে কত রকমই বলে। আবার কেউ কেউ বলে, রাজা রাণী নাকি ধরা পড়েন নাই,—সেই দেবতা এসে তাঁদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন। ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস না ওটা উপন্যাস তার ঠিক কি ? এটা না হয় মুসলমানের রচা। তা থাক্ গিয়ে,—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি ? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছি এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।"

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ একবার তামাক সাজিয়া খাইতে খাইতে আমরা দশ স্থানে লিখিয়া এতদিন ধরিয়া বহুবার তামাক সাজিলাম, খাইলাম,—

ঢালিয়া সাজিলাম, তাহাও খাইলাম, এবং এখনও ঢালিতেছি, সাজিতেছি, খাইতেছি, এবং নিঃশেষপীতধূমপটলে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছি,—কিন্তু কোন্‌টা কাহার রচা কথা, আর কোন্‌টাই বা সীতারামের আসল ইতিহাস, তাহার আর কোন অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছি না!

সীতারাম বাঙ্গালী,—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান। আমরাও বাঙ্গালী। সীতারামের ইতিহাস যে আমাদেরই গৌরবের ইতিহাস, সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; বাঙ্গালী বলিয়াই সীতারামের ইতিহাসের সমাদর হয় নাই। বিদেশের ইতিহাসলেখকেরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া আমাদের ললাটে এক দুরপনেয় কলঙ্করেখা টানিয়া দিয়াছেন; আমাদের জীবন, আমাদের দৃষ্টান্ত, আমাদের ইতিহাস, সে কলঙ্করেখা অপসারিত করিতে পারিতেছে না। যে দুই এক জন বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি তাহা কথঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারিত, সীতারাম তাঁহাদের মধ্যে একজন; কিন্তু সীতারামের উপন্যাস আছে, সীতারামের ইতিহাস কৈ?

বহুদিনের পরপীড়নযাতনায় আমাদের অস্থিমজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জীবন আছে, কিন্তু সকলেই জীবন্মৃত; তাহার উপর আবার সকলেরই মেরুদণ্ড পুত্রকলত্রভারে অল্লাধিক অবনত হইয়া পড়িয়াছে! সুতরাং যাহা কিছু অবসর, তাহা অর্থচিন্তাতেই সঁপিয়া দিয়াছি। কে কোথায় কি বলিল, কে কোথায় কি লিখিল,—কে তাহার সন্ধান লয়, কেই বা তাহার প্রতিবাদ করে?

আলোচনার অভাবে অনেক "ঐতিহাসিক ব্যক্তিই" বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া পড়িয়াছেন, সীতারামও যে সেই পথে গমন করিবেন, তাহাতে আর দুঃখ কি? এখনও দুই শত বৎসর যায় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই সীতারামের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে;—যাহা কিছু এখনও শুনিতে

পাওয়া যায়, সে কেবল উপন্যাস, জনশ্রুতি, অথবা পিতামহীর উপকথা; তাহার কতক হিন্দুর রচা কথা, কতক মুসলমানের রচা কথা, এবং পাছে রচা কথার অভাব থাকিয়া যায়, সে খেদটুকু পূরণ করিয়া যাহা বাকী ছিল, তাহাও বঙ্কিমবাবুর রচা কথায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল যেন একটু একটু করিয়া বাতাস ফিরিতেছে;—বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করিবার জন্য কিছু কিছু আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। এই শুভ দিনে কেহ কি সীতারামের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন না? উপন্যাস লেখা সহজ কথা,—একটু ভিত্তি পাইলেই হইল,তার পর ঘরে বসিয়া তামাকের ধূমরেখা অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট অংশ গড়িয়া তুলিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ইতিহাস লেখা সেরূপ সহজসাধ্য নহে। সময়, অর্থ, শ্রম,—উৎসাহ, অনুরাগ, অধ্যবসায়, সকলগুলিই হয় ত নষ্ট হইতে পারে। নষ্ট হয় হউক, কিন্তু তথাপি স্বদেশের সাহিত্যসেবকদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করি, তোমরা কেহ স্বদেশের বিলুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখ। ইহাতে অর্থাগম হইবে না, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকাবৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু কেহ যদি যত্ন চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর ললাটকলঙ্ক দূর করিতে পার, আমরা দশ জনে মিলিয়া তাহার ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিব!

সীতারামের ইতিহাস আমাদিগের গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু তাহা সংকলন করিবার উপাদানের বড়ই অভাব। হিন্দু সে ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন দিনই চেষ্টা করেন নাই; মুসলমান তাহা লিখিয়াছেন, কিন্তু সত্যোদ্ঘাটনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; ইংরাজ কেবল সীতারামকে একজন "দস্যু দলপতি বিদ্রোহী" বলিয়াই গ্রন্থ-সমাপন

করিয়াছেন। সুতরাং সে কালের লেখকদিগের হাতে পড়িয়া সীতারামের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে।

সীতারামের বীরত্বকাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বীরকীর্ত্তির শেষচিহ্ন এখনও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। মহম্মদপুরের দুর্গপরিখা প্রায়ই জলশূন্য শুষ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে তাহার সীমাচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সীতারাম নাই, কিন্তু তাঁহার রামসাগরের স্বচ্ছ সলিলে এখনও গৌরবদীপ প্রতিফলিত হইতেছে। সিংহদ্বার জরাজীর্ণ হইয়াছে, রাজপুরী বন্য শ্বাপদের লীলাভূমি হইয়াছে, দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে;—কিন্তু বাঙ্গালী কেমন করিয়া নিপুণহস্তে দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর সারি সারি তোপ সাজাইয়া বীরবিক্রমে বাদশাহের বলদর্পিত ফৌজদিগকে পদদলিত করিয়া মোগল-সেনাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহার শেষনিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই! তাহা দেখিবার জন্য আমাদের বাঙ্গালীহৃদয়ে তত দুর কৌতূহল হয় না; আমরা অবসর পাইলে ইংরাজ নবাবদিগের পদানুসরণ করিয়া, কত লাথি গুঁতা খাইয়া, রেল, ষ্টীমারে হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া, দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা পাহাড়ে ইংরাজকীর্ত্তি দেখিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হই। কিন্তু দেশের কোন্ নিভৃত কোণে বাঙ্গালীর স্বহস্ত-রচিত কোন্ পুণ্যকীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান লই না। বাঙ্গালী মহম্মদপুরের সীতারামের দুর্গপ্রাচীরে পদচালন করিবার অবসর পায় নাই, কিন্তু অনুসন্ধাননিপুণ ইংরাজ পরিব্রাজকেরা তাহার উপর দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অনেকবার সীতারামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য এক

জন সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ * সীতারামের কীর্ত্তিকলাপের যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহাই সীতারামের একমাত্র লিখিত ইতিহাস,—কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহারও অধিকাংশই উপন্যাস!

—※—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাস।

সীতারাম ঐতিহাসিক চরিত্র; সে চরিত্র লইয়া উপন্যাস লিখিতে গিয়া তাহার ঐতিহাসিকতা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সীতারামের কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে আবার নূতন করিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে, মুসলমানেরা ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলা দেশ বাহুবলে পদানত করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিতেন;—কালক্রমে জন কতক ইংরাজ বণিক্ বাণিজ্য করিতে আসিয়া রোরুদ্যমান বালক-বালিকার গ্রাসবিগলিত মিষ্টলড্ডুকের ন্যায় মোগলের হস্তচ্যুত সোণার রাজ্য কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এই বর্ণনা ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে।

মুসলমানেরা যে অনেকবার বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা। কিন্তু কোনদিনই মুসলমান বাঙ্গলা দেশে

* J. Westland Esqr. C. S.

একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শাসন করা দূরে থাকুক, সকল স্থানে রীতিমত দীর্ঘকাল রাজস্ব সংগ্রহ করিবারও সুবিধা হয় নাই। কখন কোন অংশে পদানত হইত, তখনই আবার কোন অংশ স্বাধীন হইয়া উঠিত। সুতরাং মুসলমান শাসনকালে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করা, বাহুবলে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবার কল্পনা করা, সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া, কেহই অন্যায়, অবৈধ কার্য্য বা বাতুলতা বলিয়া মনে করিতেন না।

পাঠান-সেনা বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার জন্য অসিহস্তে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিল। কিন্তু সেকালের বাঙ্গালীও দুর্ব্বল হস্তে অসি চালনা করিত না। স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্বদেশরক্ষার জন্য, স্বাধীনতারক্ষার জন্য বাঙ্গালী অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছিল;—শেষে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ পদানত করিতে না পারিয়া, যাহা পদানত হইল, তাহা লইয়াই পাঠান ভূপতিগণ মুসলমান রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন।

কালক্রমে হিন্দু মুসলমানের বৈরভাব চলিয়া গিয়াছিল; মুসলমানের অধীনে হিন্দু, এবং হিন্দুর অধীনে মুসলমান, এক গ্রামে এক দেশে শান্তি ও প্রীতিতে বসতি করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটেরা যখন বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার জন্য বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন বাঙ্গলা দেশে তিন শ্রেণীর তিনটি প্রবল শক্তি বর্ত্তমান। এক দল হিন্দু ছিলেন,—তাঁহারা কোন দিনই মুসলমানকে করপ্রদান করেন নাই। এক দল মুসলমান ছিলেন,—তাঁহারা মোগলকে প্রভুপদে বরণ করিতে অসম্মত। আর এক দল হিন্দু ছিলেন,—তাঁহারা কখন কখন মুসলমানকে করপ্রদান করিলেও, সুযোগ পাইবামাত্র স্বাধীন হইয়া উঠিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। মোগলের সঙ্গে এই তিন দলেরই শত্রুতা বাধিয়াছিল, সে যুদ্ধে বাঙ্গালা দেশ হতবল হইলেও,

স্থিতিল,—কখন মোগলকে সম্রাট্ বলিয়া সেলাম করিল, কখন আবার সময় পাইয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিল না। পাঠান ভূপতিগণ অনেকবার সুবর্ণরেখাপারে তাড়িত হইলেন, বাঙ্গলা দেশে মোগলের একাধিপত্য বিস্তৃত হইল; কিন্তু তবুও বাঙ্গলা দেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলের শাসনাধীন হইল না;—ইহাই সেকালের ইতিহাস।*

আজ যাহারা অশ্বপদতাড়নভিয়ে "শতহস্তেন বাজিনঃ" বলিয়া সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, সেকালে তাহারা অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়াছিল। আজ যাহারা বালকদিগকে একখানি ছুরি হাতে করিতে দেখিলে তাড়াতাড়ি আঙ্গুল কাটিবার ভয়ে ছুরিখানি কাড়িয়া লইয়া বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হাতে তুলিয়া দেয়, সেকালে তাহাদেরই বালকবৃন্দ লাঠি, তরবারি লইয়া খেলা করিত,—আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণও কোষাকুষি ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

সম্রাট্ আকবর, এই সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বাঙ্গলা দেশে মোগলের একাধিপত্য স্থাপন করিবার আশায়, যথাক্রমে টোডরমল্ল এবং মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আকবরের বাহুবলে ভারতবর্ষে মোগলের প্রবল প্রতাপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল;—এলাহাবাদ, আগরা, অযোধ্যা, আজমীর, গুজরাট, বিহার, বাঙ্গলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান, মালব, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগরে সুবা সংস্থাপিত হইয়াছিল।† রাজা টোডরমল্ল সুবে বাঙ্গলার সমুদায় সকর

* "The province of Bengal paid a nominal submission to the throne of Delhi, but during several reigns had been virtually independent."—Mill's History of British India, Vol. II. p. 303.

† আইন অ কবরি।

ভূমি ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভাগ করিয়া দিয়া, বার্ষিক ১০৬৯৩১৫২ টাকা রাজকর নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন;—কিন্তু এই রাজকর কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারেন নাই। *

মহারাজ মানসিংহ আসিয়া বাহুবলে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিয়া নিরূপিত রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন; পাঠান স্বর্ণরেখাপারে তাড়িত হইল, প্রতাপাদিত্যের "যশোর নগরধাম" ধূলিপরিণত হইল, অনেকেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজকর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন;—কিন্তু তথাপি আশানুরূপ রাজকর সংগৃহীত হইল না।

মানসিংহের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর মানসম্ভ্রম চলিয়া গেল; বাঙ্গালী আবার স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। সম্রাট্ আরঙ্গজীব আসিয়া যখন বাহুবলে পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, বাঙ্গলা দেশ তখন একপ্রকার স্বাধীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরঙ্গজীব সেই দেশ করায়ত্ত করিবার আশায়, আপন পৌত্র আজিমশ্বান্ এবং আপন অনুচর মুর্শিদকুলী খাঁকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহারা উভয়েই ঢাকার রাজধানীতে থাকিয়া রাজ্যশাসনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ যখন লৌহমুষ্টিতে রাজকরসংগ্রহে ব্যস্ত, বাদশাহ আরঙ্গজীব তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। আরঙ্গজীবের নাম আজিও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সে সময়ের লোক তাঁহার নামে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, মুসলমান মসজেদে হিন্দুস্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তীর্থদর্শনেও

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

হিন্দুদিগের বিড়ম্বনার একশেষ হইতেছিল;—সুতরাং হিন্দুমাত্রেই মুসলমান-শাসনের উপর বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ যদি কঠোরহস্তে রাজকর সংগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী হয় ত আরঙ্গজীবের অত্যাচার একেবারেই অনুভব করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইল না;—মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলা দেশে ১৩ চাক্‌লা এবং ১৬৬০ পরগণা সংস্থাপন করিয়া বার্ষিক ১৪২৮৮১৮৬ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিলেন। * এই রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক এক জন "ফৌজদার" নিযুক্ত হইলেন; এবং কেহ সহজে রাজকর না দিলে, একের জমিদারী অন্যের হাতে সমর্পণ করিবার নিয়ম হইল। এত দিনের পর হিন্দুর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। যে জমিদার অধীনতা স্বীকার করিতে বা রাজকর প্রদান করিতে অসম্মত, নবাব সরকারে তাঁহারই জমিদারী অন্য লোকের নামে লিখিত হইতে লাগিল, এবং সেই অন্য লোক, লোকলস্কর যোটাইয়া, সুবাদারী ফৌজ এবং জমিদারী লাঠিয়াল লইয়া, বিদ্রোহীদিগের জমিদারী কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। এতদিনের পর বাঙ্গালীর গৌরব যায় যায় হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর এই সংকট সময়ে সীতারামের আবির্ভাব। সুতরাং সীতারামের ইতিহাস বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। সীতারাম কে? কেমন করিয়া তিনি ইতিহাসে পরিচিত হইলেন, কেমন করিয়া তাঁহার পদোন্নতি হইল—তাহা বুঝিতে হইলে মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবী আমলের আমূল বিবরণ পাঠ করা আবশ্যক।

---

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ-বিপ্লব।

বাঙ্গলা দেশের ভৌগলিক [illegible] বিচক্ষণ ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে,

"বহিঃশত্রুর পক্ষে বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ [illegible]

ভাগ্যকি [illegible]

[illegible] তাড়িত করি [illegible]

উত্তরে উত্তুঙ্গ তুষার শৃঙ্গ সমুন্নত করিয়া [illegible] প্রহরীর মত বীরদর্পে দণ্ডায়মান; [illegible] প্রতিধ্বনি [illegible]; পূর্ব্বে একপার্শ্বে অভেদ্য গিরিপ্রাচীর; কেবল পশ্চিম [illegible] অরণ্য [illegible] স্থানে কত মহাবন, কত গুপ্ত গিরি [illegible] বঙ্গভূমি বীরসন্তানের জন্য [illegible] আক্রমণ করা সহজ হয় [illegible]

সেকালে পথঘাটের সুব্যবস্থা ছিল না। [illegible] পরস্পরকে এমন অভিন্নভাবে প্রেমালিঙ্গন করিত

হইত, বুঝি সমুদায় দেশ জলার্ণব,—কোন দিকেই কূল কিনারা নাই। সেই জন্ম দিল্লীর ফৌজ সহসা বঙ্গভূমি আক্রমণ করিতে পারিত না; যাহারা আক্রমণ করিবার জন্ম আসিত, বাঙ্গলার জল বায়ু তাহাদিগকে অল্প দিনের মধ্যেই আক্রমণ করিয়া বসিত; শত্রুর আক্রমণ বীরপ্রতাপে প্রতিহত করা সহজ, জলবায়ুর আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ নহে; দিল্লীশ্বরের অনেক ফৌজ এইরূপে বঙ্গদেশে জীর্ণ কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত।

পাঠান বা হিন্দু জমিদারগণ যদি দলবদ্ধ হইয়া পশ্চিম সীমা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে দিল্লীর ফৌজ বহু বৎসরেও গৃহ-প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িত না; সুতরাং মোগল আসিত; কখন কখন বাঙ্গলা দেশ পদানত করিত, আবার অবসর বুঝিয়া বাঙ্গালী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিত।

মহারাজ মানসিংহ পাঠানের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে পাঠান আর ভাল করিয়া মাথা তুলিতে সাহস পায় নাই। উড়িষ্যা পাঠানের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল; অবসর পাইলে তাহারা সুবর্ণরেখা পার হইয়া বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিত। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আর পাঠানরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারে নাই। পাঠান-শক্তি চূর্ণ হইলে, বাঙ্গলা দেশে জমিদারদিগের শক্তিই একমাত্র প্রতিকূলশক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। যত দিন দিল্লীর প্রবল প্রতাপ ছিল, ততদিন জমিদার-দিগের বিচ্ছিন্ন শক্তিতে মোগল শাসনকর্ত্তা বিচলিত হইতেন না। কিন্তু শাহজাহানের শেষ জীবনে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল।

বাদশাহের পুত্রগণ পিতার জীবনকালেই সিংহাসন ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন; যে যেখানে ছিলেন, শাহাজাদাগণ সকলেই সসৈন্যে

রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতা পুত্রে গৃহকলহ উপস্থিত হইল; বাঙ্গলা দেশের উপর কাহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিল না। আরঙ্গজীব যখন পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, ভারতবর্ষে তখন বাহুবলের প্রবল প্রতাপ। বাঙ্গলায় জমিদারদিগের মধ্যেও বাহুবলের অভিনয় আরম্ভ হইল। কে কাহার রাজ্য কাড়িয়া লয়, তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকিল না। মোগল রাজপ্রতিনিধি ঢাকার রাজধানীতে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন, নবাব ইব্রাহিম খাঁ একদিনের জন্যও সে বাহুবলের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন না,—দয়া করিয়া যে রাজা মোগলকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন, ইব্রাহিম খাঁ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং মোগলের শাসনক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়িল।

সকলেই তাহা বুঝিল। উড়িষ্যাসীমায় দাঁড়াইয়া পরাজিত পাঠান সর্দারগণ তাহা দেখিলেন, বিদ্রোহলোলুপ বাঙ্গালী জমিদারগণ তাহা দেখিলেন, কেবল দেখিলেন না নবাব ইব্রাহিম খাঁ। সুতরাং উপযুক্ত অবসর পাইয়া দেশের মধ্যে তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বৰ্দ্ধমান অঞ্চলের সভাসিংহ সেই বিদ্রোহের মূল।

সভাসিংহ এক জন ক্ষুদ্র জমিদার; বৰ্দ্ধমানাধিপতির এক জন সামন্ত মাত্র। কিন্তু ক্ষুদ্র জমিদারীর মানসম্ভ্রম লইয়া সভাসিংহ সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উড়িষ্যাবাসী পাঠানদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। রহিম খাঁ তখন পাঠানদিগের সর্দার; পাঠান সর্দার মহোল্লাসে সুবর্ণরেখা উত্তীর্ণ হইলেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণরাম প্রকাশ্য যুদ্ধে নিহত হইলে

লেন, রাজকুমারী বন্দিনী হইলেন, রাজকুমার জগৎ রায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, বৰ্দ্ধমান মোগলের হস্তচ্যুত হইল।

এব্রাহিম খাঁ সংবাদ পাইয়াও বিদ্রোহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমার জগৎ রায় ঢাকায় উপস্থিত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার আশায় যখন সত্য সত্যই করুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তখন ইব্রাহিম খাঁ যশোহরের ফৌজদার নুর উল্লার উপর এক পরোয়ানা জারি করিয়াই নিরস্ত হইলেন। নুর উল্লা নিরাপদে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন; সিপাহীগণ যুদ্ধশিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি সসৈন্যে হুগলী পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহিসেনার ভেরীনিনাদে ফৌজদারের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! তিনি শত্রুসেনা আক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না; স্বয়ং সসৈন্যে হুগলী দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া শত্রুসেনার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষা হইল, ফৌজদার রজনীযোগে নৌকারোহণে যশোহরে পলায়ন করিলেন। হুগলী দুর্গ সভাসিংহের হস্তগত হইল! ভাগীরথীর উভয় তীরে,—কলিকাতা, চন্দননগর এবং চুঁচড়ায়,—ইউরোপীয় বণিগ্‌গণ বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অনুমতি চাহিলেন, এবং সেই অনুমতি উপলক্ষে ক্ষিপ্রহস্তে দুর্গপ্রাচীর রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই বুঝিল,—"জোর যার মুল্লুক তার,"—মোগল আর কাহাকেও বাহুবলে রক্ষা করিবে না, মোগলের প্রবল পরাক্রম এতই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে!

সত্য সত্যই মোগল পরাক্রম নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সভাসিংহ এবং রহিম খাঁ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রবল গর্জ্জনে সিংহনাদ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে সেনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল,

নদীয়া ও বর্দ্ধমানের বিস্তৃত জনপদ বিদ্ধস্ত হইল, সভাসিংহ বর্দ্ধমানে রাজধানী নিরূপণ করিয়া রহিম খাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রিয়বিকার সভাসিংহের কাল হইল! তিনি কামান্ধ হইয়া বর্দ্ধমান-রাজকুমারীকে সবলে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। বীরবালিকা বসনাঞ্চলে শাণিত ছুরিকা লুকাইয়া রাখিতেন, সভাসিংহ তাহা জানিতেন না। সেই ছুরিকা উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সভাসিংহ বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া বালিকাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন, বালিকা সেই শাণিত লৌহ আপন বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিলেন!

সভাসিংহ পরলোক গমন করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ নিরস্ত হইল না। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ দেশ লুণ্ঠনে ব্যস্ত হইলেন; রহিম খাঁ রহিম শাহ নামে বাঙ্গলার স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর রহিম শাহের করায়ত্ত হইল। ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় বসিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দিনযাপন করিতেছিলেন, সুতরাং বিদ্রোহ-বার্ত্তা অবগত হইয়াও প্রতিবিধানের আয়োজন করিলেন না। যাঁহারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে কেবল এই বলিয়াই নিরস্ত করিলেন যে, "গৃহবিবাদ বড় ভয়ানক বিপদ; তাহাতে লিপ্ত হইলে পরমেশ্বরের সন্তানগণ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে; নরহত্যা মহাপাপ; ঘরে ঘরে বিবাদ বাধাইয়া অনর্থক নরহত্যা করিয়া ফল কি? বিদ্রোহীদিগের বাহুবল পরিশ্রান্ত হইলে তাহারা আপনিই সরিয়া পড়িবে;—না হয়, দিন কতক, বাদশাহের অরবিস্তর রাজকরের ক্ষতি হইবে।" *

* Stewart.

বিদ্রোহিগণ মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার লুঠিয়া লইল, সুতানটীর গোলে চালে আগুণ ধরাইয়া দিল, টাকার জন্য অবরোধ করিয়া থাকিল, রাজমহল ও মালদহ পর্য্যন্ত করায়ত্ত করিয়া লইল। আরঙ্গজীব এই সকল কথা অবগত হইয়া, ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপন পৌত্র আজিমশ্বানকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

সভাসিংহ পাঠানের সহায়তা লইয়া স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। মোগল নিরাশ্রয়, পাঠান নতশির;—এসময়ে পাঠানের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া বাহুবলে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে কি হইত, সভাসিংহ তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। সভাসিংহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গলা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সভাসিংহ যখন মোগল প্রতাপ বিকম্প করিতেছিলেন, তৎসমকালে দক্ষিণবঙ্গে আর এক জন বাঙ্গালী স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। ইনিই ইতিহাসবিখ্যাত সীতারাম রায়। মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করেন, তখন সীতারামের নাম দক্ষিণবঙ্গে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সীতারাম পাঠানকে আহ্বান করেন নাই, একাকী বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সীতারাম দেশ লুণ্ঠন করেন নাই, ধীরে ধীরে যাহা সঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। সীতারামের স্বাধীন রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই; প্রভাতের সুখস্বপ্নের মত অল্পক্ষণেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন তাহার সকল কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিবারও উপায় নাই। সেই সুখ-স্বপ্নও কায়স্থসন্তান কত বৎসর ধরিয়া কেমন করিয়া নিপুণ হস্তে রাজ্যের গঠন ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার গৌরব

প্রতিষ্ঠাপত্র করিবার অবসর পায় নাই,—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কি সেকালে, কি একালে, বাঙ্গালী সীতারামের ইতিহাস সংকলনের জন্য সময় ও অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় নাই। সেই জন্য সীতারামের জন্মভূমিতে সীতারামের উপন্যাস আছে, সীতারামের ইতিহাস নাই।

—•—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদ কুলী খাঁ।

মুর্শিদ কুলী খাঁ ব্রাহ্মণসন্তান। দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান, সুতরাং অতি অল্প বয়সেই দাস-বিপণীতে নীত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ব্রাহ্মণবালক হাজি সুফিয়া নামক এক জন সম্পন্ন মুসলমানের ক্রীতদাস হন। বালকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিশোরকান্তি দেখিয়া মুসলমান স্নেহার্দ্র হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর দাসকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, বিদ্যাশিক্ষার্থ আপন পুত্রদিগের সঙ্গে ইস্পাহান নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে দেশে ব্রাহ্মণবালকের তীক্ষ্ণ প্রতিভা অল্প দিনেই বিবিধবিদ্যা অধিকার করিল, কিন্তু আশ্রয়দাতা হাজি সুফিয়া অধিক দিন জীবিত থাকিলেন না। হাজি সাহেবের প্রধান ক্রীতদাস বলিয়া কোন

ধনী, মহারাষ্ট্রবাহিনী

স্বয়ং সম্রাট্

হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, শিক্ষা দীক্ষা এবং সহবাসগুণে কুলী খাঁ খাঁটি মুসলমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমান শাসনে ঐকান্তিক অনুরাগে, মুসলমান শক্তির বিস্তারে অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিল বলিয়া, কুলী খাঁ মুসলমানদিগের নিকটে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তিনি যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করেন, এ দেশের তখন এতই বিশৃঙ্খল অবস্থা যে, অন্যান্য দেশের রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া বাঙ্গলা দেশ রক্ষা করিতে হইত। রাজকর সংগৃহীত হইত না,—যাহা হইত, তাহাতে সামরিক ব্যয়ই কুলাইয়া উঠিত না।

অধিক দিন বিশৃঙ্খল ভাব থাকিল না। সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্বান্ তখন বাঙ্গলার নবাব নাজিম। তিনি বাহুবলে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থান পদানত করিলেন, কুলী খাঁ কঠোর হস্তে রাজকর সংগ্রহ করিয়া বৎসরে এক কোটী টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাঙ্গলা দেশে মোগলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সূত্রপাত হইল। ইহাতে কুলী খাঁর প্রশংসাবাদে দিল্লীর দরবার পূর্ণ হইয়া পড়িল। আজিমশ্বানের তাহা সহ্য হইল না। তিনি গোপনে কুলী খাঁকে হত্যা করিয়া কণ্টক দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। কণ্টক দূর হইল না, আজিমশ্বান্ই বাঙ্গলা দেশ হইতে তাড়িত হইলেন। কুলী খাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা দেশের রাজস্বনির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করিলেন।

মোগল যত দিন সেনাসাহায্যে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততদিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তরবারি সাহায্যে দেশ জয় করা সহজ কথা, তরবারি সাহায্যে দেশ শাসন করা সহজ কথা নহে। লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া কিছু কাল তাহাদিগকে পদানত রাখিয়া ফল কি? তাহারা ত অবসর পাইলেই আবার অধীনতা

খ্রীষ্ট

...শ ১৩

...লায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত

...ন্থের নামে

...অঙ্গীকার করিলে

ও রাজধানী সংস্থা...

...প্রতিনিধি

রাজ্যশাসনের অধিকার

... । সুতরাং ...

... করিতে ...

বাহুবল কত? মোগল সেনার শিক্ষাকৌশল কিরূপ? কি উপায়ে দুর্গ-রচনা করিলে, কি প্রণালীতে সেনার শিক্ষা দিলে, কর প্রদান না করিয়াও স্বাধীন রাজ্য গঠন করা যায়, সে কথা কাহারও মস্তকে স্থানলাভ করিল না। আশু নিরুদ্বেগ হইবার জন্য সকলেই করপ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু করপ্রদান করিয়াও নিষ্কৃতি হইল না। মুর্শিদ কুলী খাঁ "শুভ পুণ্যাহ" নামে এক নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। বৈশাখ মাসে রাজধানী মুর্শিদাবাদের শেঠভবনে এই পুণ্যাহের সূচনা হইল। * যাহার নিকট যত রাজকর প্রাপ্য, তাহা পরিশোধ না করিলে আগামী বর্ষের জন্য কাহাকেও জমিদারী-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইত না। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জমিদারী ভোগ করিবার ভরসায় পদানত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, জমিদারীর জীবন কেবল এক বৎসর। যে কারণেই হউক, বৎসরের রাজকর কপর্দ্দক মাত্র বাকী থাকিলে, পর বৎসরে জমিদারী অন্যের হস্তগত হইবে। তখন মোগল রাজনীতির গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ আপন দৌহিত্রীপতির উপর রাজস্ব-সংগ্রহের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহার অত্যাচারের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। কত জমিদার বন্দী হইলেন, কত জনের রাজবাটী ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল, কত জনকে বাঁধিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া চলিল। সেখানে নানা-পূতিগন্ধময় অপবিত্র দ্রব্যে এক নরককুণ্ড পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে,—গর্ব্বান্ধ মুসলমান তাহার নাম রাখিয়াছে "বৈকুণ্ঠ"! রাজকর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া হিন্দু জমিদারগণ সশরীরে সেই বৈকুণ্ঠে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন! মান গেল, সম্ভ্রম গেল, ধর্ম্ম গেল, স্বাধীনতা ত পূর্ব্বেই

* The Fifth Report.

চলিয়া গিয়াছিল, মুসলমান শাসনের উপর লোকের মন ক্রমেই বিচলিত হইয়া উঠিল। (১)

এই সকল বিশৃঙ্খলার অবসর পাইয়া, সীতারাম ধীরে ধীরে মহম্মদপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন; এক জন ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সীতারাম কায়স্থ বটে,—কিন্তু পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থ; (২) পাছে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিলে সীতারামের বীর-চরিত্রে বাঙ্গালীর কলঙ্ক বিদূরিত হয়, ইহাই বোধ হয় 'ইতস্ততের' মূল!

যাঁহারা পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ, তাঁহাদের জীবনচরিত সমালোচনা করিবার সময়ে সহসা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে বাঙ্গালী করযোড়ে মোগলের দ্বারদেশে সসম্ভ্রমে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান, সীতারাম যে সেই বাঙ্গালী, সে কথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সমসাময়িক বাঙ্গালী যে ভাবে চিন্তা করিতেন, যে ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, সে উপায়ে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, সীতারাম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই;—বোধ হয়, সেই জন্যই ইংরাজ লেখক তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তথাপি সীতারাম যে বাঙ্গালী কায়স্থ, সে বিষয় আর নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই,—তাঁহার বংশ বাঙ্গলা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

---

(১) যাঁহারা এই বৈকুণ্ঠালয়ের ব্যবহার সবিস্তার কাহিনী পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা ষ্টুয়ার্টকৃত বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করিবেন; ইংরাজ-বণিকের কাগজ পত্রেও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

(2) J. Westland, Esqr., C. S.

সীতার

কুকম, তাঁহাকে

চাকলা ভূষণার ভিতর দিয়া একটি শাখানদী প্রবাহিত হইত, উহা এখনও তেমনি বক্রগতিতে বহিয়া চলিয়াছে; সেকালে তাহার নাম ছিল মধুমতী,—এখনও মধুমতী নদী অনেকের নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমান যশোহর জেলার ভিতর দিয়া মধুমতী প্রবাহিত। নদীটি সুবিস্তৃত নহে, কিন্তু তথাপি স্রোতস্বতী, বর্ষাকালে তাহার খরস্রোত বড়ই প্রবল হইয়া থাকে।

মধুমতীতীরে হরিহরনগর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। গ্রামখানি বাঙ্গলার ইতিহাসে অপরিচিত; দেশে যেমন শত শত গণ্ডগ্রাম ছিল, ইহাও সেইরূপ; তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস নাই, অথবা থাকিলেও তাহা অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মহাকবি কালিদাস মহাবীর রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিবার সময়ে বাঙ্গলা দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, এখনও বাঙ্গলা দেশের প্রায় সেইরূপ অবস্থা;—চারি দিকে নদ, নদী, খাল, বিল; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, নগর, যেন বর্ষাসলিলপ্লাবিত জলাশয়ের মধ্যে অসমান দ্বীপপুঞ্জ। কেবল তফাৎ এই যে, সেকালে নৌসেনার পরিচালনায় বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ছিল, এখন নৌকারোহণে নদীপার হইতে বলিলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই উইল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

অন্যান্য প্রদেশ যেমন নদীবহুল, ভূষণা চাকলাও সেইরূপ নদীবহুল স্থান। সকল নদীর নাম বড় ভূষণার লোকেও জানিত না। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও সাগরচুম্বিত সুন্দরবন, আর চারি দিকে কেবল গঙ্গা ও ভাগীরথীর শত শত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা; সুতরাং সে প্রদেশ যেমন উর্ব্বর, তেমনই শস্যশালী বলিয়া পরিচিত ছিল। সহসা সে দেশে শত্রুসেনা প্রবেশ করিত না। বহিঃশত্রুর পক্ষে সমতলক্ষেত্রে পদাতিক ও অশ্বারোহী লইয়া ভূষণায় উপস্থিত হওয়া যেমন সহজ

দেশের রাজধানী হইয়া

নগরেই [illegible] জন্ম [illegible]

কোনও

অদ্যাপি

হইয়া

যাহাই

স ও অসাধারণ

যে প্রতিভা ... ক মহামেকতের

দ্বারে বর, দুয়ার সিংহদ্বার রচনা

হইয়া থাকে

নেশালা

ই মনে হয় না। কিন্তু

প্রতিভার

অনটন যে,

অর্থচিন্তায়

পাঠ্যপুস্তকের

সকলই জীর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

দুর্বল হইতেছি, মনে ভীরু হইতেছি ... পেক্ষী

নী বলিয়া

বাঙ্গালী বালকদিগকে কখন গোচারণ করিতে হইত, কখন ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত, কখন শস্য বিক্রয় করিতে হইত, কখন বা স্বহস্তে হাটবাজার সমাধা করিতে হইত। ইহাতে শিক্ষা—অর্থাৎ পুস্তকপাঠে ব্যাঘাত পড়িত, কিন্তু শরীর সবল হইত, মন প্রফুল্ল থাকিত।

সীতারামের সম্পদের মধ্যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র তালুক; সুতরাং সর্ব্বদা তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। তিনি অশ্বারোহণে মাঠে মাঠে বেড়াইতেন, এবং বাল্যকাল হইতেই বাহুবলের জন্য সকলের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীতারাম যখন মাঠে মাঠে অশ্বচালন করিতেন, তখন বালকহৃদয়ে কত কল্পনা জাগিয়া উঠিত, কত কল্পনা বিলীন হইত, তাহা কে বলিতে পারে? এই বাল্যভ্রমণে পথ ঘাট অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, লোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, সীতারামের বীরবাহু দেশরক্ষায় সক্ষম হইবে বলিয়া অনেকেই তাঁহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সীতারাম হিন্দু; হিন্দুপরিবারে প্রতিপালিত হইয়া বাহুবল অপেক্ষা ভগবৎকৃপার উপর অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। সে বিশ্বাস তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস; পরবর্ত্তী ইতিহাসে সীতারাম তাহার অনেক প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

মোগলপ্রতাপ নিস্তেজ হইলে দেশের মধ্যে মগ এবং ফিরিঙ্গির উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা স্থলপথে, জলপথে—যখন যে দিকে সুবিধা পাইত—গ্রাম, নগর লুণ্ঠন করিত। তাহাদের অত্যাচারে সমুদ্রকূলের সমৃদ্ধ জনপদ সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছিল।* মোগল যখন আর প্রজারক্ষায় মনোযোগ দিলেন না, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকে তখন

* Long's Selections from the Records of the Government of India, Vo. I. ২৮০

আত্মরক্ষার জন্য লাঠি, তরবারির আশ্রয় লইল। বাধ্য হইয়া লোকে সাহসে বুক বাঁধিল। যাহা কঠিন, তাহা অভ্যাসগুণে সহজ হইয়া যায়; দক্ষিণবঙ্গের লোকের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া লাঠি, তরবারি চালনা করা সহজ হইয়া উঠিল। এই আত্মরক্ষাকার্য্যে সীতারাম অনেকগুলি যুবক দলের অধিপতি হইলেন। ইহা হইতেই কালে রাজ্যগঠনের সূত্রপাত হইল; কিন্তু নিদ্রাতুর ইব্রাহিম খাঁ তাহার সম্বাদ লইলেন না; মহাবীর যশোহরের ফৌজদার তাহার গতিরোধ করিতে সাহস করিলেন না। সীতারামের দল ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সৌভাগ্য লক্ষ্মী।

সীতারামকে কেহ চিনিত না। কিন্তু ক্রমে যখন সীতারামের যশোগৌরব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তখন মুখে মুখে সীতারামের নাম দেশ বিদেশে ছুটিয়া চলিল। সামান্য অবস্থা হইতে যাহারা উন্নতি-সোপানে আরোহন করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বকাহিনী কেহ লিখিয়া রাখে না; যাহার যেমন অভিরুচি, এক একটি কারণ উদ্ভাবন করিয়া জনশ্রুতি রচনা করে। মহাবীর নেপোলিয়ান সামান্য অবস্থা হইতে কি কৌশলে

জগদ্বিখ্যাত ফরাসীরাজ্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, তাহার রহস্যনির্ণয়ের জন্য ইতিহাসলেখকগণ কতই আড়ম্বরপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; নেপোলিয়ান নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গোপনে গোপনে যখন উন্নতিসোপান গঠিত করিতেছিলেন, তখন কেহ তাঁহাকে চিনিত না;—লোকে যখন নিশীথে নিদ্রাতুর, তিনি তখনও পাঠগৃহের ক্ষুদ্র কক্ষে গভীরভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত! সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীও কতকটা সেইরূপ। প্রতিভা, সাহস, বাহুবল এবং অধ্যবসায় ভিন্ন তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না; কিন্তু যতদিন তিনি উন্নতিশিখরে আরোহণ করেন নাই, ততদিন কেহ তাহা স্বীকার করিত না; অগত্যা সীতারামের উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, এক এক জন এক একরূপ জনশ্রুতির রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জনশ্রুতি হইলেই যে তাহা একবারে অলীক হইবে, এমন কোনও কথা নাই; কিন্তু তথাপি কৌতূহলপরায়ণ জনসমাজ জনশ্রুতি প্রচার করিবার সময়ে তাহার মূলানুসন্ধানের আবশ্যকতা স্বীকার করে না। সেই জন্য জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য থাকিলেও, লোকমুখেক্রমে তাহা এরূপ রূপান্তরিত হইয়া যায় যে, অবশেষে সে মৌলিক সত্যটুকু আর খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হয় না। সীতারামের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে।

লিখিত ইতিহাস নাই, সুতরাং জনশ্রুতিই সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীর একমাত্র উপন্যাস। সে উপন্যাস হিন্দুর রচা, কি মুসলমানের রচা, তাহারও স্থিরতা নাই। কিন্তু সে উপন্যাসে সীতারামের চরিত্রে কোনও কলঙ্ককালিমা সংযুক্ত হইবার অবসর পায় নাই। অবসর এবং অধ্যবসায় থাকিলে, এই সকল জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এখনও পুরাতত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতগণ সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীর কথঞ্চিৎ লুপ্তোদ্ধার করিতে পারেন, কেবল সেই ভরসায় জনশ্রুতিগুলি সংগৃহীত করিয়া দিলাম।

এখন যেখানে মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সীতারামের বীরকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার নিকট দিয়া মধুমতী নদী প্রবাহিত। সেই মধুমতীর অপর তীরে হরিহর নগরে সীতারামের পৈতৃক তালুক ছিল। বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগরেও সীতারামের কিছু জমী জমা থাকার কথা শুনা যায়। সীতারাম বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন;—তিনি পৈতৃক তালুক পরিদর্শনের জন্য সর্ব্বদাই অশ্বারোহণে হরিহরনগর হইতে শ্যামনগর অথবা শ্যামনগর হইতে হরিহরনগরে যাতায়াত করিতেন। লোকে বলে যে, একদিন এইরূপে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্থানে আসিয়া অশ্বক্ষুর মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িল; সীতারাম অনেক উত্তেজনা করিয়াও ঘোটককে চালনা করিতে পারিলেন না। সীতারাম তখন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং বাহুবলে অশ্বক্ষুর উত্তোলন করিলেন। অন্য লোকে হয় ত আবার অশ্বারোহণে গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেন; কিন্তু সীতারাম সে দেশের পথ ঘাট বিলক্ষণ চিনিতেন, কোন স্থানে কখনও এমন করিয়া অশ্বক্ষুর প্রোথিত হয় নাই;—সুতরাং তিনি সে স্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যেখানে অশ্বক্ষুর প্রোথিত হইয়াছিল, সেই স্থান খনন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভূগর্ভে এক লৌহময় ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। কৌতূহলাবিষ্ট সীতারাম লোকদল সংগ্রহ করিয়া ত্রিশূল লক্ষ্য করিয়া যতই খনন করিতে লাগিলেন, ততই ক্রমে চূড়া, তাহার পর গম্বুজ, তাহার পর স্তম্ভরাজি, অবশেষে লক্ষ্মীনারায়ণের একটি দেবমন্দির বাহির হইয়া পড়িল! হিন্দুর দেশের প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির

কতকালের মৃত্তিকাস্তর ধীরে ধীরে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, অবশেষে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—কৃষক নিঃসন্দেহে তাহার উপর দিয়া হল-চালন করিয়া বেড়াইত। সহসা সেই দেবমন্দির আবার লোকচক্ষুর সম্মুখীন হইল; তখন দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল; সকলে মিলিয়া প্রবল উৎসাহে মৃত্তিকারাশি আহরণ করিতে লাগিল। সেই মৃত্তিকানিহিত দেবমন্দিরে কোন দেবমূর্ত্তি ছিল না, কেবল একটি "লক্ষ্মীনারায়ণ" বাহির হইল। লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামশিলা, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দেবতা; যে গৃহে নিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হয়, সে গৃহ কখনও লক্ষ্মীহীন হয় না। সীতারাম পরম হিন্দু, তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন; লোকে এই অযাচিত দেবানুকম্পা লাভ করিতে দেখিয়া সীতারামের পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে সীতারামের প্রতিভায় দেবানুকম্পাবলে লোকবল সংযুক্ত হইল। ইহাই তাঁহার উন্নতির মূল।

দেবতা যাহার সহায়, মানুষ সহজেই তাহার গোলাম হয়। দেশের মধ্যে এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে হিন্দুগণ সীতারামের পক্ষভুক্ত হইতে লাগিলেন; অবশেষে তাঁহাদের সহায়তায় সীতারাম হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন। যশোহরের ইতিহাস-লেখক এই জনশ্রুতিকে "বিকৃত জনশ্রুতি" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট বাদানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভূগর্ভ-নিহিত দেবমন্দিরের কাহিনী সত্য হইতে পারে না; কারণ, এখন যেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে, তাহার চূড়া নাই, ত্রিশূল নাই, এবং তাহা সমতল-ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, আদৌ ভূগর্ভ-নিহিত নহে; অথচ লোকে তাহাকেই আদি-মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান মন্দির যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, গঠন-

প্রণালী দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি লোকের ভক্তি কিছু অচলা, তাই তাহারা আধুনিক মন্দিরকেও আদি-মন্দির বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। পাণ্ডারা সকল স্থানেই এরূপ করিয়া থাকে। কেবল ইহা হইতেই কোনও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।

সীতারাম সম্বন্ধে দ্বিতীয় জনশ্রুতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। সেকালে দক্ষিণবঙ্গে "বার ভূঁইয়া" নামে দ্বাদশ জন করসংগ্রাহক ছিলেন; তাঁহারা কালক্রমে স্বাধীন হইয়া বাদশাহের স্থায্যগণ্ডা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে পাঠাইয়া দেন,—সীতারাম তাঁহাদিগকে দমন করিলেন বটে, কিন্তু নিজে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। নবাব রাজকর চাহিলে বাদশাহের দোহাই দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাদশাহকেও এক কপর্দ্দক রাজকর দিলেন না।

পূর্ব্বকাহিনী যাহাই হউক, যখন হইতে লোকে সীতারামের কথা শুনিতে পাইল, তখন হইতে তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে আর কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। সীতারাম যে দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে রাজ্য নাই, সে রাজধানীও ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সীতারামের যে সকল গৌরব-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়স্থল; সে পরিচয়ে সীতারাম বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন;—বিদেশের ইতি-হাসলেখকগণ বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যা-য়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু সীতারামের বীরকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদপুরে সীতারামের বীরকীর্ত্তির যে সকল ভগ্নাবশেষ এখনও

বর্ত্তমান আছে, তাহা বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের চিহ্ন। কেন না, বাঙ্গালীই তাহার মুল। মহম্মদপুরে রাজদুর্গ ছিল, দুর্গপ্রাচীরের উপর সারি সারি কামান পাতা ছিল, সিংহদ্বারে বীরবিক্রমে সেনাপতি ও সেনানায়কগণ অশ্বারোহণে সমবেত হইত,—তাহার মধ্যে সকলই বাঙ্গালীর কথা। বাঙ্গালী দুর্গ রচনা করিয়াছিল, বাঙ্গালী কামান, গোলা, বারুদ প্রস্তুত করিয়াছিল, বাঙ্গালী বীরবিক্রমে স্বহস্তগঠিত দুর্গ-প্রাচীরের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া স্বহস্তরচিত কামানের মুখে অগ্নি-সংযোগ করিয়া মোগলের গতিরোধ করিয়াছিল! বাঙ্গলা দেশে অনেক পুণ্যস্থান আছে, কিন্তু যেখানে দাঁড়াইলে বাঙ্গালীর ললাটকলঙ্ক ধৌত হইয়া যায়, মহম্মদপুর ভিন্ন এমন পুণ্যতীর্থ আর নাই;—পুণ্যতোয়া মধুমতীতীরে সীতারামের রাজদুর্গ যে দিন বাঙ্গালী পরিব্রাজকের নিকট অধিকতর সুপরিচিত হইবে, সে দিন সীতারামের স্মৃতি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহম্মদপুর।

মহম্মদপুরে যে সকল প্রাচীন-কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে তাহার মধ্যে সীতারামের রাজদুর্গই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই দুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা; বহু বৎসরের অযত্নে অনাদরে তাহার পূর্ব্বশোভা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে কালে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই রাজদুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল, স্থানে স্থানে এখনও সেই সকল প্রাচীন দুর্গের সীমাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল দুর্গের গঠনকৌশল এবং আধুনিক ইংরাজদুর্গের গঠনকৌশল একরূপ নহে। আজ কাল সামরিক-বিদ্যার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া মানুষে মানুষ খুন করিবার যত সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেকালে মানবজ্ঞানের ততটা শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। কৌশল অপেক্ষা বাহুবলেরই প্রাধান্য অধিক ছিল; সুতরাং সেকালের লোকে কেবলমাত্র মৃত্তিকা সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর রচনা করিত। এই মৃণ্ময় দুর্গের বিশেষ কোন গঠনকৌশল ছিল না; কারণ, সেকালের বীরসিংহেরা কৌশল অপেক্ষা বাহুবলেরই অধিক সমাদর করিতেন। তাঁহারা বাহুবলে অসীম সাহসে মৃণ্ময় দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে জানিতেন। ভারত-

পুরের দুর্গ ইংরাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে; ইংরাজদিগকে কত ক্লেশে বারংবার বিপর্য্যস্ত হইয়া ভরতপুরের দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। সেই ভরতপুরের দুর্গও মৃণ্ময় দুর্গ।

সীতারাম যে মৃণ্ময় দুর্গ রচনা করেন, তাহা চতুষ্কোণ; চারি দিক প্রদক্ষিণ করিলে এক ক্রোশ হইতে পারে। ইহার চারি দিকে দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে গড়খাই ছিল; সে পরিখার চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। উত্তর এবং পূর্ব্বদিকের পরিখা কালক্রমে জলশূন্য শুষ্কভূমিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু পশ্চিমদিকে এখনও অনেক জল, এবং দক্ষিণ দিকের পরিখা বহুবিস্তৃত, এখনও দেখিতে ঠিক নদীর মত। এই সকল পরিখা খনন করিবার সময়ে যে স্তূপাকার মৃত্তিকা উত্তোলিত হয়, তাহা লইয়াই সীতারাম দুর্গ প্রাচীর রচনা করেন। এই দুর্গ বাগজানি সেজোর। শত্রু আসিয়া অবরোধ করিলে পাছে জলকষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য দুর্গমধ্যে অনেকগুলি সরোবর খনিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটির জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল রহিয়াছে। দুর্গের তোরণদ্বার কোথায় ছিল, তাহা এখন আর ভাল করিয়া নির্ণয় করা যায় না; যশোহরের ইতিহাসলেখক ওয়েষ্টল্যাণ্ড অনুমান করেন যে, দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণেই সম্ভবতঃ দুর্গদ্বার ছিল। এরূপ অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরাজ দপ্তরে সীতারামের দুর্গের একখানি প্রাচীন মানচিত্রে ঐরূপ লিখিত আছে। সেই মানচিত্র দেখিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও একখানি লিথোগ্রাফ প্রস্তুত করিয়াছেন।

সীতারামের রাজবাটী এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এক জন ইংরাজ পরিব্রাজক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার গঠন-কৌশল কিরূপ ছিল, তাহা এখন আর নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সীতারামের রাজধানীতে অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্ত

একালের তুলনা লইয়া বিচার করিতে গেলে তাহার কোনটিই গঠন-সৌষ্ঠবে উল্লেখযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে না। তখন গঠনসৌষ্ঠব বা বাহ্যাড়ম্বর ছিল না; মুসলমানপ্লাবিত বঙ্গদেশে তাড়াতাড়ি রাজদুর্গ ও রাজধানী সংস্থাপন করিবার জন্য সীতারাম গঠনসৌষ্ঠবের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; কেবল মোগলের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রাণপণে দুর্গপরিখা ও দুর্গপ্রাচীর রচনা করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে কোনরূপে রাজধানী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র।

সীতারাম হিন্দু, অথচ তাঁহার রাজধানীর নাম মহম্মদপুর, ইহা হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মহম্মদপুর নামক কোনও প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানে সীতারাম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; পুরাকীর্ত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নগরের নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। এখন যেখানে মহম্মদপুর, সেকালে সে স্থান আদৌ লোকসমাজে পরিচিত ছিল না। মহম্মদ খাঁ নামক একজন মুসলমান সাধুপুরুষ সেই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজন করিতেন। সীতারাম যখন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, মুসলমান সাধু তখন কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে সীতারাম সাধুপীড়ন করিতে অসম্মত হইয়া সাধুর নামানুসারেই নব-সংস্থাপিত রাজধানীর নামকরণ করিতে সম্মত হইলেন;—সাধু স্থান ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই হইতে তাহার নামানুসারে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর নামে লোকসমাজে পরিচিত হইল। ইহা যশোহর প্রদেশের জনশ্রুতি; কিন্তু এই জনশ্রুতির সঙ্গে সীতারামের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে বলিয়াই এ স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম।

কয়েকটি কারণে মহম্মদপুর নূতন রাজধানীর উপযোগী হইয়াছিল।

সীতারামের বাল্যজীবনের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়া ঐ প্রদেশ সীতারামের সুপরিচিত ছিল, নদীবহুল স্থান বলিয়া সহসা বহিঃশত্রুর পক্ষে ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিবার সুবিধা ছিল না; মুসলমানপ্লাবিত বঙ্গদেশে নূতন করিয়া হিন্দুরাজধানী গঠন করিতে হইলে যেরূপ স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, মহম্মদপুর সর্ব্বাংশেই তদুপযোগী ছিল বলিয়া, সীতারাম সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

—※∷※—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তিকলাপ।

সীতারামরায়ের অধিকাংশ কীর্ত্তিকলাপ কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার অন্দরমহলে আর জনমানব প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গল এবং হিংস্র জন্তুর লীলা-ভূমি! কালে কত রাজার বিচিত্র রাজধানী এই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সীতারামের রাজধানীও যে সেই পথে গমন করিবে, তাহাতে বড় বিস্ময়ের কারণ নাই! কিন্তু সীতারামের কথা ত ইতিহাসের নিকট সে দিনের কথা; এখনও দুই শত বৎসর অতীত হয় নাই! ইহার মধ্যেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল কেন? ইহার একমাত্র

উত্তর এই যে, কাল পরাজয় করিয়া যে সকল পুরাতন কীর্ত্তিমন্দির এখনও লোকলোচনের বিস্ময় আকর্ষণ করিতেছে, সেগুলি কত যত্নে, কত দীর্ঘকালে, কত সুনিপুণ স্থপতিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের প্রাণপণ চেষ্টায় গঠিত হইয়াছিল; তাই তাহারা আজিও বর্ত্তমান। আর সীতারামের রাজধানী? তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া রাতারাতি অশিক্ষিত কারিকর লইয়া যে সকল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে না ছিল গঠনকৌশল, না ছিল বাহ্য বৈভব! দুর্গরচনা শেষ হইবামাত্র কোনরূপে বাড়ী ঘরগুলি গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন!

এখন প্রাসাদকক্ষগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, দীর্ঘিকা এবং পরিখাগুলি বর্ত্তমান আছে। সেই সকল জলাশয়ের মধ্যে "রামসাগর" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুন্দর, এবং সীতারামের দুর্গরচনাকৌশলের পরিচায়ক। দুর্গের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই এই সুবিস্তৃত জলাশয়; উত্তরদক্ষিণে ১৫০০ হাত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৬০০ হাত পরিসর। সিংহদ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে এই জলাশয়ের নিকট দিয়া আসিতে হইত। জন কত সাহসী বীরপুরুষ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে গোলাবর্ষণ করিতে পারিলে, কেহ সহজে দুর্গপ্রাচীরের নিকটে আসিতে সাহস পাইত না! ভারতবর্ষে শত শত দুর্গপ্রাচীর আজিও বর্ত্তমান আছে। তাহার অধিকাংশই গিরিদুর্গ। সমতল শস্যক্ষেত্রের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করা সেরূপ সহজ নহে। তথাপি সমতলক্ষেত্রেও কয়েকটি দুর্গচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহার কোন দুর্গেই সিংহদ্বারের সম্মুখে এরূপ বিস্তৃত জলাশয় খনিত হয় নাই। ইহাই সীতারামের দুর্গরচনার মৌলিকত্ব।

রামসাগরের নানারূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। সীতারাম যেখানে রামসাগর খনন করেন, সেখানে এক সময় একটি দরিদ্র বিধবার পর্ণকুটীর ছিল। বিধবার একটিমাত্র পুত্র। তুষ্টা একদিন

"সীতা সীতা" বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিতেছিলেন; সীতা নিকটে ছিল না, কিন্তু রাজা সীতারাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা কি প্রয়োজনে সীতারামকে স্মরণ করিতেছিলেন, তাহা জানিবার জন্য সীতারামের কৌতূহল হইল। কিন্তু বৃদ্ধা তাঁহার ভ্রমসংশোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্র সীতারামকে স্মরণ করিতেছিলেন, রাজা সীতারামকে স্মরণ করেন নাই। সীতারাম সে কথা শুনিবার পাত্র নহেন, তিনি বৃদ্ধার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। চিরদুঃখিনী বিধবা আর কেমন করিয়া রাজাধিরাজ সীতারামকে অভ্যর্থনা করিবেন? তাঁহার কুটীরেই বা কি আছে যে, তাহা লইয়া রাজহস্তে উপঢৌকন দিবেন? তিনি দৈন্য জানাইয়া বিনীতভাবে সীতারামের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন; সীতারাম তাঁহাকে তদ্রূপ কাতর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি নিতান্তই কিছু উপহার দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আঙ্গিনার পার্শে যে লাউগাছটি লতাইয়া উঠিয়াছে, সেইটি পাইলেই সীতারাম চরিতার্থ হইবেন। বৃদ্ধা বলিলেন—তথাস্তু। সীতারাম তখন অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৃদ্ধার কি এমন কোন গুপ্ত বাসনা নাই যাহা রাজানুকম্পায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? বৃদ্ধার একটি ক্ষুদ্র বাসনা ছিল;—জলকষ্টে তাঁহাকে বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত। তিনি তখন একটি কূপ খনন করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। কূপখননের জন্য লাউগাছের মূলদেশ খনিত হইল। সীতারাম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, তথায় প্রচুর অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে! তখন আর কূপ খনন করা হইল না;—সীতারাম সেই অর্থে একটি বিস্তৃত দীর্ঘিকাখননের আদেশ করিলেন। নিকটে সেনাপতি মেনাহাতি দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, দীঘি কত বড় হইবে? সীতারাম বলিলেন, তোমার আকর্-

সন্ধানে তীর যত দূর ছুটিয়া যাইবে, তত দূর পর্য্যন্ত খনন করিয়া দিও। মেনা হাতি আকর্ণ-সন্ধানে তীর ছাড়িয়া দিলেন;—সে তীর বহুযোজন দূরে কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রভূমি অতিক্রম করিয়া ভূমিতল স্পর্শ করিল। সীতারাম আর ব্রহ্মত্র হরণ করিলেন না;—যত দূর পারিলেন, খনন করিয়া দিলেন। লোকে তাঁহার এই অলৌকিক কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য দীঘির নাম "রামসাগর" রাখিয়া দিল। *

মহম্মদপুরের রাজধানীতে যে আরও অনেকগুলি জলাশয় খনিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, তাহার একটির ইতিহাস হইতে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র "চিত্তবিশ্রাম" নামক রমণীয় উদ্যানবাটীর কল্পনা গঠন করিয়াছিলেন। সেই সরোবরের নাম "সুখসাগর,"—তাহা দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে, অনতিদূরেই খনিত হইয়াছিল। সুখসাগরের আয়তন খুব বড় নহে, আকারে নিতান্ত ছোটও নহে। মধ্যস্থানে একটি দ্বীপের ন্যায় মৃত্তিকাস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে;—গৌরবের দিনে সেই দ্বীপের উপর সীতারাম একটি সুশীতলসুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্যে দুর্গমধ্যে বাস করিবার অসুবিধা হইলে, সীতারাম কখন কখন চিত্তবিনোদের জন্য সেই হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিতেন। তাহার এখন আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই।

দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আর একটি দীঘি বর্ত্তমান আছে। তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী অনেক;—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নলদীর মারের মহাশয়ের

* ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই জনশ্রুতি সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সীতারাম যে আরও অনেক জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। সেকালের হিন্দু রাজারা প্রজাসাধারণের অন্নজলে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সাধ্যানুসারে অন্নজল যুক্ত করিয়া দিতেন।

পাচক ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সেই জলাশয়ে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সেই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, নড়ালের বাবুরাও স্বর্ণমুদ্রার লোভে অনেক অর্থব্যয় করিয়া জলশোষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* তাঁহাদের ভাগ্যে পণ্ডশ্রমই সার হইল! কিন্তু শুনা যায় যে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবার একজন এক ঘটি টাকা কুড়াইয়া পাইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস যে, সেখানে এখনও সাত রাজার ধন অজ্ঞাতে যক্ষ মহামতির কঠিন শাসনে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

সীতারাম যেরূপ ভাবে মুসলমান-শক্তিকে প্রতিহত করিয়া স্বাধীন-ভাবে বাহুবলে রাজ্যগঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল যে, আজ হউক, কাল হউক, মুসলমান একদিন না একদিন তাঁহার রাজদুর্গ ধ্বংস করিবার জন্য সাগ্রহে বাহুবিস্তার করিবে। সেই জন্য তিনি কেবল দুর্গপ্রাচীর সুদৃঢ় করিয়া এবং প্রাচীরমূলে গড়খাই খনন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; মুসলমানেরা পুরী অবরোধ করিলে যাহাতে হিন্দুর যত্নসঞ্চিত ধনরত্ন কিছুতেই কুক্ষিগত করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্য দুর্গমধ্যে এই দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার গুপ্ত কোষাগার। সঞ্চিত অর্থ এই জলাশয়ে নিমজ্জিত হইত; আবশ্যক হইলে, সন্ধাননিপুণ সীতারাম তাহা উত্তোলন করিতে পারিতেন। এখন আর কেহ সে সন্ধান জানে না, সেই জন্য সীতারামের গুপ্ত কোষাগার চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* The Naral Baboos, who for some time had possession of the templeland (debuttur) as Muhammedpore, made diligent search in the tank, to find any stray treasure which might be in it. They tried to pump out the water, but there dwells a genius in the tank who frustrated their impious efforts. Every night the water rose as much as it had gone down by the pumping during the day, and they had to give up.—J. Westland.

জলাশয় খনন করা সেকালে বড়ই পুণ্য কার্য্য বলিয়া লোকসমাজে পরিগণিত ছিল। তাহার জন্য পুণ্যশীল জলদাতা রাজসরকার হইতে উপাধি পাইতেন না, কিন্তু হিন্দুর দেশে হিন্দুর সমাজে হিন্দু নরনারীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। বাঙ্গালাদেশে এইরূপ অনেক প্রাচীন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবে, কাহার ব্যয়ে এই সকল জলাশয় খনিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রত্যেক প্রাচীন জলাশয়ের সঙ্গেই কোন না কোন মহাত্মার পুণ্যনাম সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজদিগের পুরাতন সমাধিমন্দিরগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন। তাহাতে অবশ্যই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি সজীবিত রাখিবার সদুপায় হইতেছে। কিন্তু সে গুলি কেবল ইষ্টকস্তূপ,—তাহাতে লোকলোচনের আনন্দ-বর্দ্ধন করে, বিস্ময়-উৎপাদন করে, কচিৎ বা কাহারও কল্পনাপ্রবণ উর্ব্বর মস্তিষ্ক অতীতের স্বপ্নরাজ্যের বিচিত্র আকাশকুসুম চয়ন করিবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়! কিন্তু তাহাতে পরবংশীয় দীনদরিদ্র প্রতিবেশীদিগের প্রাত্যহিক দুঃখ-দুর্দ্দশার কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে না! আর হিন্দুর সেই সকল জলদানের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি,—এই সকল হিন্দুহৃদয়ের লোকহিতৈষণার সমাধি-মন্দিরগুলি, হিন্দুজীবনের পরহিতব্রতের এই সকল জীবন্ত নিদর্শনগুলি, কালক্রমে শৈবালে, শাম্বলে, পঙ্কে, দূষিত সলিলে অব্যবহার্য্য হইয়া কত লোকের কীর্ত্তিলোপ করিতেছে! সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যদি এই সকল সমাধিচিহ্ন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে হয় ত আরও বহুকাল তাহা দেশের উপকার সাধন করিত।

ইংরেজেরা তাঁহাদের নগণ্য গতজীব সহযোগীদিগের সমাধিমন্দিরের জরাজীর্ণ প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন।*

* The Bengal Obituary.

আমাদের দেশের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া এবং পুরাতন জলাশয়গুলির কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া কেহ যদি গ্রন্থরচনা করেন, তাহা হইলে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ সজীব থাকিতে পারেন। আমরা সীতারামের ইতিহাস পাই নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ-স্থানীয় প্রাচীন দেবমন্দির এবং পুরাতন দীর্ঘিকাদি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহারও কোনরূপ বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি না!

সীতারাম যে সকল জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কেবল সাধারণভাবে তাঁহার পুণ্যপিপাসা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নহে; সেকালে সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার সকলেই সেরূপ সৎকীর্ত্তিসংস্থাপন করিতেন;—তাহাতে কাহারও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটিত হইত না। কিন্তু সীতারামের জলাশয়গুলি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র, বুদ্ধিকৌশল এবং দূরদর্শিতা বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে "রামসাগরের" উল্লেখ করিয়া তাঁহার সংগ্রামকৌশলের পরিচয় দিয়াছি, দুর্গপরিখার বর্ণনা করিয়া তাঁহার রচনা-কৌশলের আভাস দিয়াছি, এবং "সুখসাগরের" পরিচয় দিয়া তাঁহার বিলাস-বাসনার প্রকৃতিনির্ণয় করিয়াছি। অন্যান্য জলাশয়গুলিতেও এইরূপ একটি না একটি পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

এদেশে অনেকেই জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খনন-প্রণালীর দোষে কিছু দিন পরে সে সকল জলাশয় হইতেই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে ইহার অনেকরূপ কারণ নির্দেশ করেন। কেহ বলেন মাটির দোষ, কেহ বলেন জলাশয়-তীরে পুষ্পবাটিকা নির্ম্মাণ করিবার দোষ, এবং অনেকেরই ধারণা এইরূপ যে, এই উভয়দোষ-বর্জ্জিত হইলেই সমস্ত জলাশয়গুলি একেবারে দোষসম্পর্কশূন্য হইত! কিন্তু প্রধান দোষ এই যে, খনিতমৃত্তিকা কেমন করিয়া কোথায় স্থাপন

দৃষ্টিপাত

স্থিত সুবি-

ভীর কচিতেছে তাল তমাল

কাশ

রিকেল পুগ,

রোপণ করা হইয়াছে। কি

বিন্যাসের

য়াছিলেন;

রোবরে তাহার

বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র

রামসাগরের ন্যায়

উপাদেয়। সীতারাম

ত্তিকারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার

সরোবরতীর হই

নিয়া চারিদিকে প্রাচী

খিয়া গিয়াছেন।

জনার পূর্ণ করিয়া

আর "কৃষ্ণ

তে পারে নাই; তাহার

করিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব "কৃষ্ণ-

করিয়া, আধুনিক সময়েও সরোবরখননকালে

করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছে

peculiarity

making

স্থানে স্থানে তড়াগাদি খনন করা ভিন্ন সীতারাম এক নদী হইতে আর এক নদীতে গমনাগমন ও নৌকা-চলাচলের সুবিধার জন্য সুদীর্ঘ খাল খনন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কিরূপ দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

নবম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের আয়োজন।

আমরা আজকাল অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল। দেশে যে অন্ন বস্ত্র নাই, তাহা নহে; নানা কারণে দেশের অন্ন বস্ত্রে আমাদিগের অভাবপূরণ হয় না। বহুবিধ ঘটনাপরম্পরায় দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমরা লজ্জারক্ষার জন্য ম্যানচেষ্টারের তাঁতিদিগের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইতেছি, লৌহদ্রব্যের জন্য সেফিল্ডের কর্ম্মকারগোষ্ঠীর হাপরের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছি;—জীবনধারণের জন্য, কায়িক মানসিক সাংসারিক সকল প্রকার দৈনিক অভাব মোচনের জন্য বিদেশের লোকের কাছে কর-

ঘোড়ে দাঁড়াইয়া আছি। সেকালে এরূপ দুর্দশা ছিল না। বাঙ্গালী তখন নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত করিয়া লইত। হাতে অর্থ থাকিলে লোকে ঘরে বসিয়া সকল দ্রব্যই সহজে সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু সীতারামের সে সুবিধা ঘটিল না।

তিনি মুসলমানশক্তি উপেক্ষা করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী সংস্থাপন করায় রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; সুতরাং অন্যান্য গ্রাম নগর হইতে আবশ্যকমত দ্রব্যজাত আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে তেমন সহজ ছিল না। অথচ তাঁহার সকল দ্রব্যেরই নিতান্ত আবশ্যক। স্বাধীনতারক্ষায় জন্য দুর্গপ্রাচীর গঠিত হইল, নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সেনাদল গঠিত হইল, কিন্তু অস্ত্র শস্ত্র সেরূপ সহজে সংগৃহীত হইল না। কামান বন্দুক গুলি গোলা ও বারুদের সৃষ্টি হইয়া অবধি সমরশিক্ষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ নাই, আর ধর্ম্মযুদ্ধ নাই, আর ধনুঃশর,—সম্মোহন, একাঘ্নী, পাশুপতের দিন নাই। এখন যুদ্ধ করিতে হইলে তদুপযোগিনী শিক্ষা চাই,; যুদ্ধ শিখাইতে হইলে তদুপযোগী গুলি গোলা বারুদ কামান ও বন্দুক চাই। সুতরাং সীতারামের চারিদিকেই অভাব। তিনি নবাবের অধিকৃত রাজ্য হইতে এই সকল দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে লোকে শীঘ্রই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিত; নবাবও তাহার গতিরোধ করিবার অবসর পাইতেন। সীতারাম সে পথ অবলম্বন করিলেন না।

তিনি নানা স্থান হইতে বিবিধশিল্পবিশারদ কার্য্যকুশল শ্রমজীবী-দিগকে পরম সমাদরে নূতন রাজধানীতে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহাদিগের জন্য রাজধানীতে দুর্গমধ্যে এবং দুর্গের বাহিরে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। নবাব ইহার বিন্দুবিসর্গও

জানিতে পারিলেন না; কেহ ঘুণাক্ষরেও তাঁহার অভিসন্ধির অনুসন্ধান পাইল না। অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদপুরে বাজার বসিয়া গেল। সে বাজারে সকল দ্রব্যই মিলিত; মিলিত বলিলে ঠিক বলা হইল না;—সকল দ্রব্যই প্রস্তুত হইত। তাহাতে বহু লোকের অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইল। লোকে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া দোকান খুলিতে আরম্ভ করিল। তখন মহম্মদপুরে বসিয়া সেই সকল কারিকরেরা কেহ বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ চারুশিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল; কেহ বা যুদ্ধোপযোগী বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধ্যে সীতারামের বাজার আর সামান্য বাজার বলিয়া মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর সুবৃহৎ শিল্পাগার হইয়া উঠিল।

সীতারামের এই শিল্পাগারে যে সকল তৈজসপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে;—ক্রমে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। সীতারামের শ্রমসহিষ্ণু কর্ম্মকারগণ যেরূপ নিপুণ হস্তে সুদৃঢ় কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মোগল তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কি কৌশলে সীতারাম সহসা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য যাহারা কিছুমাত্র জানিবার অবসর পায় নাই, তাহারা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকচক্ষুর নিকট সীতারামের কার্য্যকলাপ বিচিত্র ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

সেকালের বাঙ্গালী কর্ম্মকারেরা যে সত্য সত্যই কামান গড়িতে জানিত, তাহা কাহারও রচা-কথা নহে; সেরূপ দুই একটি কামান এখনও বর্ত্তমান আছে; অবশিষ্টগুলি অযত্নে অনাদরে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালসহকারে কণাকলিত হইয়াছে। তথাপি

অঞ্চলেও এই সকল পুরাতন কামান দেখা যাইত; কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ কালেক্টার তাহার কোনটি লইয়া রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোনটি গলাইয়া কয়েদীদিগের বেড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, কোনটি বা তিন টাকা মূল্যে নিলাম করিয়া দিয়াছেন! *

মুর্শিদাবাদের বিলুপ্ত-গৌরব প্রাচীন রাজধানীর নিকটে এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর হস্ত-গঠিত একটি পুরাতন কামান বর্ত্তমান আছে। কালে তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি তরুশাখা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে মাটি হইতে শূন্যদেশে উঠাইয়া ফেলিয়াছে;—দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই কামানের নাম "জাহানকোষ";—ওজনে ২১২ মণ; ২৮ সের বারুদ না হইলে তাহার বৃকোদর পূর্ণ হইত না। এই কামানের উপর যে ফলকলিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, কার্য্যপরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাধীনে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দনের দ্বারা, ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঢাকা নগরে এই বৃহদায়তন কামানটি গঠিত হয়। * ঢাকাই কর্ম্মকারদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকার মোগল রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মহম্মদপুরের সীতারামের রাজধানীও সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ঢাকাই কর্ম্মকারদিগের কেহ কেহ মহম্মদপুরে আসিয়া সীতারামের অস্ত্রাগার পূর্ণ

* J. Westland.

* The gun Jahan Kasha was constructed at Jahangirnagar, otherwise called Dacca, during the Darogaship of Sher Mahammud, and when Har ballav Das was mashrif (Inspector) and Janarjan chief blacksmith, in the month of Jamadi-us-sani, in the year of 11 the reign corresponding to 1047 (October 1637). Weight 212 maunds, the measure 56 dams til shamari, charge of powder 28 seers.—H. Beveridge, C. S.

করিবার সহায়তা করিয়াছিল। সে সকল অস্ত্র শস্ত্র কালগহ্বরে বিলুপ্ত না হইলে বাঙ্গালীর গঠনপ্রতিভার পরিচয় বিলুপ্ত হইত না; কিন্তু সে সকল অস্ত্র শস্ত্র যে যুদ্ধকালে শত্রুপীড়নে কতদূর সক্ষম হইয়াছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে তাহার পরিচয় একবারে বিলুপ্ত হয় নাই! মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ীতে এখনও এই সকল পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র কতক কতক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। সেলেখানার মধ্যে কোন প্রতিভাশালী শিল্পকার প্রবেশ করিলে, সে সকল অস্ত্র শস্ত্রের গঠন-কৌশল দেখিয়া অবশ্যই অপরিসীম কৌতূহল অনুভব করিবেন!

সীতারামের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি সাহসী স্বাধীন-চেতা স্বাবলম্বনপরায়ণ প্রতিভাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, তাহার অভাবপূরণের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; যত্ন চেষ্টা করিয়া স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতেন। ঘটনাসূত্রে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহুবল ভিন্ন আর কোন সম্বল ছিল না; মোগলের দেশে বাস করিয়া মোগলশক্তিকে পরাজিত করিতে হইলে অবশ্য মোগলের নিকট সহায়তালাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং বাধ্য হইয়াও তাঁহাকে স্বাবলম্বনপরায়ণ হইতে হইয়াছিল। তিনি একাগ্রভাবে প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিলে, মহম্মদপুরের রাজধানী ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারিত না। উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র পাইলে, উপযুক্ত সুশিক্ষিত সেনাদল পাইলে, উপযুক্ত অর্থভাণ্ডার লাভ করিতে পারিলে, দেশের লোকের শুভাশীর্ব্বাদ এবং সহায়তা লাভ করিতে পারিলে, অনেকের পক্ষেই বীরত্বের পরিচয় প্রদান করা সহজ হয়। স্বাধীন নরপতিদিগের পক্ষে এ সকলই সুলভ; তাঁহারা সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া জনসাধারণের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ

করেন, বহুসঞ্চিত রাজকোষে অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন প্রাপ্ত হন, রণপণ্ডিত সেনাপতিপরিচালিত সুশিক্ষিত সেনাদল আসিয়া করযোড়ে অভিবাদন করে, সুতরাং তাঁহাদের বীরকীর্ত্তির জন্য তাঁহারা যশস্বী হইলেও, সেরূপ বীরকীর্ত্তিতে কোনরূপ বিশেষত্ব সূচিত হয় না। কিন্তু যাঁহার এ সকল সুবিধা নাই, যাঁহাকে জঙ্গল কাটিয়া রাজধানী বসাইতে হয়, শস্যক্ষেত্র সমুন্নত করিয়া দুর্গপ্রাচীর গঠন করিতে হয়, কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী দরিদ্র নিরক্ষরদিগকে সম্মিলিত করিয়া সেনাদল গঠন করিতে হয়, অর্থসংগ্রহ করিয়া রাজ্যপালন, সেনাপরিপোষণ এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র গঠন করিয়া লইতে হয়, তিনি যদি প্রতিকূলশক্তিসংঘর্ষে পতিত হইয়া অল্পদিনের জন্যও স্বাধীনভাবে জয়পতাকা বহন করিতে সক্ষম হন, তবে তাঁহার জন্য ইতিহাস অবশ্যই স্বর্ণসিংহাসন গঠন করিয়া থাকে। সীতারাম বাঙ্গালী, সীতারাম নিঃসম্বল দরিদ্র কায়স্থ, সীতারাম পরাধীন বঙ্গদেশের পরাধীন ক্ষুদ্র প্রজা; কিন্তু ইতিহাস তাঁহার জন্য স্বর্ণসিংহাসন গঠন করিয়া দিয়াছে। ইহাতেই সীতারামের গৌরব; ইহাতেই বাঙ্গালীর গৌরব; এবং এই জন্যই সীতারামের ইতিহাস বাঙ্গালীর নিকট সমধিক সম্মানলাভের অধিকারী। বাঙ্গালী কি সীতারামকে সে সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? বাঙ্গালী যেরূপ উন্নত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া উৎসাহের সহিত সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, বাঙ্গালী কি সে উৎসাহের অংশমাত্রও এই সকল ঐতিহাসিক রত্নোদ্ধারের জন্য নিয়োগ করিতে গৌরববোধ করিবেন না?

দশম পরিচ্ছেদ।

শিল্পবিদ্যা।

সীতারামের রাজধানী বহুবিস্তৃত জনাকীর্ণ মহানগর হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান মাগুরা সবডিবিসনের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ১৪ মাইল দূরে এই পুরাতন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে কোনরূপ মারীভয় ছিল না; তাঁহার সযত্নপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী অন্যলোকের করতলগত হইলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইয়াছিল। সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মহম্মদপুরেই যশোহরের জেলা সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে সীতারামের পুণ্যকীর্ত্তিগুলি ধূলিপরিণত হইত না; সীতারাম এবং মহম্মদপুরের নাম লোকের নিকট পূর্ব্ববৎ সুপরিচিত থাকিত। কিন্তু ইংরাজবণিক ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে চারিদিকে যে ভীষণ কালের চিতা জ্বলিয়া উঠে, তাহার অগ্নিশিখা মহম্মদপুরেও পতিত হইয়াছিল; ১২৪৩ সালের সমকালে এমন মহামারীর আবির্ভাব হইল যে, সেই সময় হইতে মহম্মদপুর জঙ্গল হইয়া গেল; লোকে প্রাণ লইয়া দূর স্থানে পলায়ন

করিতে লাগিল ; যাহারা ইংরাজের আদেশে মহম্মদপুরের ভিতর দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করিতেছিল, সেই সকল কয়েদীদিগের মধ্যে শত শত লোক কালকবলে পতিত হইল। সুতরাং তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে! * শতাধিক বৎসর হইল, মেজর রেণেল যে সুবিখ্যাত মানচিত্র † সংকলন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান নগর বলিয়া মহম্মদপুরের নাম বৃহদক্ষরে লিখিত আছে; সে সময়েও ভূষণা চাকলার সদর কাছারী মহম্মদপুরেই সংস্থাপিত ছিল!

শিল্পের জন্য, বাণিজ্যের জন্য, সীতারামের আন্তরিক অনুরাগের জন্য মহম্মদপুরের বাজার অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, ক্ষুদ্রায়তন দুর্গের মধ্যে তাহার স্থান সংকুলন হইয়া উঠিল না। সীতারাম সেই জন্য শিল্পীদিগকে দুর্গের বাহিরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত এই বাজার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল! সীতারামের সময়ে তাঁহার নিতান্ত অনুগত লোক ভিন্ন আর কেহ দুর্গাভ্যন্তরে দোকান খুলিতে পারিত না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন যে, কেবল সেই জন্যই তিনি বিদেশাগত শিল্পকারদিগকে দুর্গমূল হইতে দূরস্থানে শিল্পাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই সকল বিপণীশ্রেণী কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও তাহার সীমা-চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

মোগল শাসনকর্তার অগোচরে অলক্ষিতভাবে তাড়াতাড়ি নগর পত্তন করায়, মহম্মদপুরে স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার প্রত্যেক ইষ্টকস্তূপের সঙ্গে সীতারামের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে বলিয়া, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক।

* Westland's Jessore. † Major Rennel's map.

রাজধানীর অন্যান্ত বাড়ীঘরের সবিশেষ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সীতারামের কল্যাণে যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

এই সকল দেবমন্দিরের অধিকাংশই গঠনকৌশলে বিশেষ গৌরব-লাভ করিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু গঠনকৌশল বা বাহ্য শোভার বাহুল্য না থাকিলেও, প্রত্যেক দেবমন্দিরেই সীতারামের এক একখানি প্রস্তরফলক নিবিষ্ট ছিল। কালক্রমে সে সকল ফলকলিপির অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছে। কে কোন্ সময়ে তাহা অপহরণ করিল, সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে হয় ত এখনও ভগ্নাবশেষ ইষ্টকরাশির মধ্যে সে সকল ফলকলিপি অনাদরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড যখন মহম্মদপুর পরিদর্শন করেন, তখন অধিকাংশ ফলকলিপিই বর্ত্তমান ছিল না; তিনি দেবপূজকদিগের মুখে তাহার যে বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাই সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিদর্শনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সে সকল ফলকলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।* সেই গ্রন্থলিখিত পাঠের সহিত ওয়েষ্টল্যাণ্ডের লিখিত পাঠের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তদবলম্বনে মন্দিরগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল মন্দিরের মধ্যে "দশভুজালয়" নামক মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই মন্দির সীতারামের গুপ্ত কোষাগার-স্থানীয় দুর্গমধ্যস্থ সরোবরতীরে সংস্থাপিত। মন্দিরটি নিতান্তই ক্ষুদ্র, দেখিতে 'বাঙ্গালা' ঘরের মত; একটি মাত্র কক্ষ, এবং কক্ষের সম্মুখে

* Bengal Monuments.

স্বল্পায়তন বারান্দা। বারান্দার সম্মুখস্থ পুরাতন খিলানগুলিও কালক্রমে পড়িয়া গিয়াছে। সেকালে 'বাঙ্গালা' ঘরের অনুকরণে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রথা ছিল। নাটোরের রাজধানীতেও অন্যান্য অনেক স্থানে রাণী ভবানীর নির্ম্মিত এই শ্রেণীর অনেকগুলি দেবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। "দশভুজালয়ে" এখন আর কোন ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই। সেকালে ইহাতে যে প্রস্তরফলক নিহিত ছিল, তাহাতে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যাইত,—

"মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী-শকে দশভুজালয়ম্।
অকারি শ্রীসীতারামরায়েন মন্দিরম্ ॥"

শ্লোকের রচনা, কিন্তু অনেকটা প্রাকৃত ধরণের; বিশেষ সুগঠিত সুখপাঠ্য অথবা সংবদ্ধ নহে। এই ফলকলিপির পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "শ্রীসীতারাম রায় কর্ত্তৃক মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।" মহী অর্থে পৃথিবী—একার্থবাচক; ভুজ দ্বি-অর্থ-জ্ঞাপক, রস ষট্-সংখ্যা দ্যোতক, ক্ষৌণী পৃথিবীরই প্রতিশব্দ, সুতরাং তাহাও একার্থবাচক। সংখ্যাগণনায় ১২৬১ হয়। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ;"—সুতরাং ১৬২১ শকে এই মন্দির নির্ম্মিত হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। ১৬২১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন ঢাকা মুসলমানের রাজধানী; আরঙ্গজীবের প্রবল প্রতাপ চারিদিকে দেদীপ্যমান; হিন্দু-দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়ানিচয় ধরাতলে বিলুণ্ঠিত; কাশীধাম সীমা-চিহ্নপরিশূন্য বিচ্ছিন্ন ভগ্নস্তূপ; তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্তম্ভের উপর সমুন্নত মুসলমান-মসজিদে "আল্লা হো আকবার" রব সদর্পে প্রতিশব্দিত!

যে লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের সৌভাগ্যসূচনার মূল কারণ বলিয়া লোকসমাজে চিরবিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্য একটী দেবমন্দির

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত। এই মন্দির অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতল গৃহ; গঠনগৌরববিবর্জ্জিত ইষ্টকস্তূপ মাত্র। ইহার অবস্থা এখনও কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববৎ সংরক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণের নামে এখনও দেবপূজা চলিতেছে, কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে, আসল লক্ষ্মীনারায়ণ আর মহম্মদপুরে নাই। মহম্মদপুর যে লক্ষ্মীহীন হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়া গিয়াছেন যে, "আসল লক্ষ্মীনারায়ণ-শিলা নড়ালের বাবুরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে!" *

লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরেও একখানি ফলকলিপি নিহিত ছিল, তাহা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত ছিল যে;—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরম্ ॥"

ইহার পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "সীতারাম রায় কর্তৃক পিতৃপুণ্য সংস্থানাশায় লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থিতির জন্য তর্কাক্ষিরসভূশকে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।" তর্ক শব্দ দর্শনজ্ঞাপক, দর্শনগুলি সংখ্যায় ছয়টি; অক্ষি দ্বি-সংখ্যাপ্রতিপাদক; রস শব্দ ষট্‌-সংখ্যাবাচক; ভূ শব্দে পৃথিবী, একার্থ-বোধক; সুতরাং অর্থযোজনা করিলে জানা যায় যে, এই মন্দির ১৬২৬ শকে নির্ম্মিত হয়। ১৬২৬ শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে মুসলমান রাজধানী উঠিয়া আসিয়াছে।

সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে, লক্ষ্মীনারায়ণের কল্যাণে যাত্রা-মহোৎসবাদিতে সবিশেষ সমারোহ হইত। তন্মধ্যে দোলযাত্রা এবং

* W[illegible]d's Jes[illegible]

রথযাত্রা উপলক্ষেই লক্ষ্মীনারায়ণের বিভবচ্ছটা সমধিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তেমন বৃহদায়তন নহে; সুতরাং তাহাতে দোলযাত্রার সমারোহ সুসম্পন্ন হইত না। তজ্জন্য সীতারাম সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণসম্মুখে পৃথক্ একটী দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে কোন ফলকলিপি ছিল না। দোলমঞ্চটি সমুন্নত, অপেক্ষাকৃত সুগঠিত এবং সুসজ্জিত;—তাহা এখনও প্রায় সেইরূপ অবস্থাতেই আছে। নবাবী আমলে দোলযাত্রার বড়ই আড়ম্বর ছিল। মুসলমান সরকারে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দোলযাত্রা উপলক্ষে এক পক্ষ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজদরবার বন্ধ থাকিত। এই প্রথা নবাব সিরাজদ্দৌলার সময় পর্য্যন্তও যে সমভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা সিরাজদ্দৌলার লিখিত একখানি পত্রে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। * দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে দক্ষিণপরিখার সমসূত্রে একটি সুবিস্তৃত দীর্ঘায়তন রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া সীতারাম রায় শ্রীঈশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের রথযাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপর দিয়া সুন্দর সুচিত্রিত রথারোহণে বিগ্রহদেব মৃদঙ্গকরতালসমন্বিত সংকীর্ত্তন-সমারোহে হেলিতে দুলিতে মথুরাগমনের পূর্ব্বস্মৃতির সৌভাগ্যগর্ব্ব উপভোগ করিতেন;—ভক্তবৃন্দকণ্ঠোচ্ছ্বাসপরিপূরিত হরিধ্বনি কোলাহল করিয়া জয় ঘোষণা করিত।

দুর্গস্থিত এই সকল দেবমন্দির ব্যতীত দুর্গসংলগ্ন কানাইনগর গ্রামে সীতারামের আর একটি দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। ঐ মন্দিরটি এখন চতুষ্পার্শ্বস্থ বিটপিরাজির মধ্যে নীরবে বিগত গৌরবের বিলুপ্ত কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরটি প্রায় সমচতুষ্কোণ; সর্ব্বত্রই বিমান, ছাদের উপর মন্দিরচূড়া; তাহা প্রায়

* Letter from Nawab Shiraj Dowla to Admiral Watson.

দুইটী চূড়া

এই ... একটী ...

করি...

...রে ধরিয়া

...টি করি...

বিরাজ...

করি...

ঘোষণা করিতেছে।

...হয় না...

...কোন স্থানে বি... ...ত হয় নাই; সুতরাং

...হইয়া

পরিষ্কার করিয়া লিখিলে কবিতাটি এইরূপ দাঁড়ায়—

"বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাযোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ॥"

পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোদ্ভবকুলকমলে যিনি ভাস্করের দীপ্তিপ্রদান করিয়া পিতৃবংশপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ভক্তিমান শ্রীসীতারাম রায় বহুবিধসৌধযুক্ত এবং সুন্দর হইতেও সুন্দর কানাইনগর গ্রামে বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রপরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী হইয়া এই বিচিত্র কৃষ্ণগেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" বাণ শব্দ ভগবান মকরকেতনের তূণীরগর্ভস্থ পঞ্চবাণ সূচনা করে; দ্বন্দ্ব শব্দের সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব হইবে না; অঙ্গ বলিতে ষড়ঙ্গই বিঘোষিত হইয়া থাকে, চন্দ্র শব্দ পাঠশালার বালকদিগের চিরাভ্যস্ত একার্থবোধক সুপরিচিত সংখ্যা। সুতরাং ১৬২৫ শকে সীতারাম রায় এই মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৬২৫ শক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন বাঙ্গালাদেশে মোগলের গৃহকলহ উপস্থিত; সম্রাটপৌত্র আজিমশান অথবা জীতদাস মুর্শিদ কুলী খাঁ,—আরঙ্গজীবের বিচারে কাহার জয় হইবে, তজ্জন্য সকলেই আগ্রহাতিশয্যে উদগ্রীব হইয়াছিলেন।

এই মন্দির-ফলকে সীতারাম আত্মবংশের উল্লেখ করিয়া আপনাকে "শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা সীতারামের আত্মশ্লাঘার পরিচয় নহে; লোকে তাঁহাকে তৎকালে কিরূপ গৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করিত, তাহারই পরিচায়ক। ভাষা কথায় লোকে যাহাদিগকে "বিশ্বাস"

ভাগ্যতুল্য উদ্ভাসক শক্তিরূপে সেকালে লোকসমাজে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রণজয় ও রাজ্যলাভ।

দিন দিন সীতারামের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সেই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া শীঘ্রই মোগলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। মোগল সে সময়ের বাদশাহ, মোগল সে সময়ের নবাব, মোগল সে সময়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সুতরাং সীতারাম মোগলের নিকট রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিচিত হইলেন। মোগল তাঁহার প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিবার জন্য যথারীতি আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সীতারামের রাজধানীর পূর্ব্ব দিকে মধুমতী নদী; তাহার পূর্ব্ব তীরেই ভূষণার বিস্তৃত জনপদ। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলা দেশ ১১ চাকলায় বিভক্ত করেন; ভূষণা তাহার মধ্যে একটি প্রধান চাকলা বলিয়া পরিচিত ছিল। ঐ চাকলার পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূষণায় একজন মুসলমান ফৌজদার থাকিবার রীতি ছিল। তাঁহার সঙ্গেই সীতারামের সর্ব্বপ্রথম কলহ উপস্থিত হইল।

সেকালের মুসলমান নবাব রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেন না, রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; সুতরাং সীতারাম মোগলকে করপ্রদান করিতে সম্মত হইলে, তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চেষ্টা করিত না। সীতারাম করপ্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি নবাবের আদেশ প্রতিপালন করিতে বা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে সীতারামের কলহ উপস্থিত হইল।

ভূষণার মুসলমান ফৌজদার অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন; অবশেষে বাহুবল প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন সীতারামের সুশিক্ষিত সিপাহিদিগের সঙ্গে ফৌজদারের ফৌজদিগের শক্তিপরীক্ষার আয়োজন হইল। মধুমতীর জলস্রোত রুধির-রঞ্জিত হইল, হিন্দু ও মুসলমানের শবদেহ কাতারে কাতারে ভাসিয়া চলিল, অবশেষে ফৌজদারের পরাজয় এবং সীতারামের জয় হইয়া সমগ্র ভূষণা অঞ্চল সীতারামের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

রাজা সীতারাম এই বিস্তীর্ণ জনপদে স্বাধীনভাবে আত্মশক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদপুরের ন্যায় আরও অনেক স্থানে দীঘি পুষ্করিণী এবং রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার পাংসা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে এবং মাগুরার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ, হরিহরনগর এবং সূর্য্যকুণ্ডে এই সকল রাজপ্রাসাদাদির কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে যে, সীতারাম নিরন্তর রাজধানীতে আলস্যে কালযাপন না করিয়া সময়ে সময়ে এই সকল প্রাসাদে বাস করিয়া স্বচক্ষে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। সুতরাং সাহস করিয়া কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা সহজ নহে। তথাপি এই

সকল ভগ্নকীর্ত্তি দেখিয়া জনশ্রুতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। সেকালের মুসলমান নবাব বা হিন্দু জমিদারগণ প্রায়ই রাজধানীর সুযত্নরচিত রাজপ্রাসাদের শীতল কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইতেন না। লোকে তাঁহাদের নাম শুনিত, কিন্তু সচরাচর চর্ম্মচক্ষে দর্শনলাভ করিতে পাইত না। ইহাতে রাজাপ্রজার মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইতে পারিত না। কিন্তু সীতারাম ইহার ব্যতিক্রম করিয়া সরল ভাবে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হইতেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্যে মোগল সহসা তাঁহার প্রবল শক্তিকে প্রতিহত করিবার অবসর পাইল না। সীতারামের রাজ্যে রাজকারাগার ছিল, বিচারালয় ছিল এবং সদর মফঃস্বলে রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য স্থানে স্থানে কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছিল;—সুতরাং তিনি যেমন বাহুবলে মোগলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া স্বরাজ্যে রাজা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। লোকে সহজেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন রাজশক্তি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। রাজবিধি যদি প্রজাসাধারণের কল্যাণকর হয়, তবে লোকে রাজবিধির প্রতি এবং রাজশক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করে, এবং রাজার ব্যক্তিগত স্বভাব যেরূপ হউক না কেন, তাঁহার নিকট রাজভক্তি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। সেকালে রাজশক্তির এরূপ অবস্থা ছিল না। রাজা কেবল স্বভাবগুণে বা ক্ষমতাবলে লোকের ভয়, ভক্তি, উপহার পাইতেন। সুতরাং রাজার স্বভাব ভাল না হইলে, তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না।

সেকালের রাজদরবারের মৌখিক রাজভক্তির বাড়াবাড়ি থাকিলেও, অনেক স্থলে আন্তরিক রাজভক্তির বড়ই অভাব দৃষ্টিগোচর হইত। সীতারামের রাজ্যে কিন্তু আন্তরিক রাজভক্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রণার সহায়, যাঁহারা তাঁহার বাহুবলের সহায়, যাঁহারা তাঁহার স্বাধীনতালাভের উৎসাহদাতা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ আন্তরিক স্নেহে তাঁহার সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া থাকিতেন যে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাঁহারা সীতারামের জয়পতাকা রক্ষা করিতে কাতর হইতেন না। এই সকল লোকের ইতিহাস, ইহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ, ইহাদিগের নামধাম সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—যাঁহাদের এখনও নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ, গবরদালান এবং মেনাহাতির নামই সর্ব্বপ্রধান। মেনাহাতির প্রকৃত নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইনি সীতারামের প্রধান সেনাপতি এবং দক্ষিণ বাহু বলিয়া এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত। দৃঢ়োন্নত বলিষ্ঠ দেহে মেনাহাতি অমানুষিক বল ধারণ করিতেন; লোকে সেই জন্য তাঁহাকে মেনাহাতি বলিয়া ডাকিত। ইনি সমস্ত দিন দুর্গমধ্যে সেনাচালনা ও রণশিক্ষা দিয়া রজনীযোগে সীতারামের সিংহদ্বারে শয়ন করিয়া থাকিতেন, সেকালের লোকে অলৌকিক শক্তিকে এত দূর বিশ্বাস করিত যে, সকলেই বলিত, মেনাহাতি এক প্রকার অমর, তাহার মৃত্যুবাণ কেহ জানে না, এবং ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুসন্ধান না বলিয়া দিলে কেহ কখনও মেনাহাতিকে নিহত করিতে পারিবে না। এই বিশ্বাসে মেনাহাতির সেনাদল সর্ব্বদাই গর্ব্বোন্নতশিরে সর্ব্বত্র আস্ফালন করিয়া বেড়াইত। অকৃত্রিম অনুরাগে, অলৌকিক বাহুবলে, অপরিসীম সাহসে এবং অবিমিশ্র প্রভুভক্তিতে এই বাঙ্গালী বীরপুরুষ স্বদেশে আত্ম-গৌরবস্মৃতি চিরস্মরণীয় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিহাসবিমুখ

বাঙ্গালী কেবল নামমাত্রই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। মহম্মদপুরে তাঁহার যে সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে, কোন বাঙ্গালী কোন দিন তাহাতে জয়মাল্য জড়াইয়া দেয় নাই!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আবু তোরাপের পরাজয়।

ভূষণা অঞ্চলে সীতারামের একাধিপত্য সংস্থাপিত হইবার পর, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আর তাঁহাকে সহসা পরাজিত করিবার অবসর পাইলেন না। মেজর রেণেল-কৃত প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় যে, সেকালের ভূষণা চাক্‌লার উত্তরে এবং পূর্ব্বে পদ্মার প্রবল প্রবাহ, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পশ্চিমে রাজসাহী ও কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধ জনপদ। পশ্চিম ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়া সীতারামকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু মধুমতী নদীর পশ্চিমতীরে দুর্গরচনা করিয়া সীতারাম আপন রাজ্য বিশেষরূপে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নবাব ধৈর্য্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সীতারামের নাম দিল্লীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সেকালে মোগল অমাত্যগণ দিল্লীর দরবার হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে জায়গীর বা রাজপদ দিবার জন্য সহজেই সনন্দ প্রদান করিতে পারিতেন।

আবু তোরাপ নামক এক জন মোগল সেনাপতি এই সময়ে দিল্লীতে বাস করিতেন। তিনি বাহুবলে সীতারামকে পরাজিত করিতে সম্মত হওয়ায়, বাদসাহের দরবার হইতে তাঁহাকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করা হইল। তোরাপ দিল্লীর দরবারে সবিশেষ প্রতিপন্ন ছিলেন, আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং আবুতোরাপ সহজেই সনন্দ হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের রাজধানীতে শুভাগমন করিয়া যথারীতি নবাবদরবারে ফৌজদারী সনন্দ দাখিল করিয়া দিলেন, এবং ভূষণা দখল করিবার জন্ত নবাবের নিকট সেনাসাহায্য পাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তখন পূর্ণিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ-দমনে ব্যতিব্যস্ত; তিনি আবু তোরাপকে সৈন্যবল প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তোরাপ বাদসাহের দরবার হইতে আসিয়াছেন; সুতরাং বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আপন যৎসামান্য সেনাবল লইয়া ভূষণার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সীতারামের চর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। দিল্লীতে বা মুর্শিদাবাদে কোথায় কি হইতেছে, সীতারাম তাহা মহম্মদপুরে বসিয়াই জানিতে পারিতেন। তিনি ভূষণা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে স্বাধীনতারক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক দল দুর্গরক্ষার জন্য মহম্মদপুরে রহিল। অপর দল লইয়া সীতারাম ভূষণার মধ্যে চারিদিকে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পশ্চিম দিক্ হইতে মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া, মধুমতী উত্তীর্ণ হইয়া, ভূষণার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে;—আবু তোরাপ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সামান্য ফৌজ মহম্মদপুরের দিকে পাঠাইয়া দিয়া সসৈন্যে ভূষণা আক্রমণের জন্য ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। তিনি জানিতেন না যে, সুচতুর সীতারামও সসৈন্যে ভূষণা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সহসা হিন্দু মুসলমানে দেখা সাক্ষাৎ হইল, আবুতোরাপ ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইতিমধ্যে সীতারামই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। আবু তোরাপের পরিশ্রান্ত সেনাদল সীতারামের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না; অনেকে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল, কেহ কেহ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, এবং যুদ্ধশেষে রুধিরচর্চ্চিত রণভূমে আবু তোরাপের বীরতনু বীরশয্যায় পড়িয়া রহিল। সীতারাম বীর। তিনি বীরবর আবু তোরাপের শবদেহ সযত্নে ভূষণার মধ্যে যথাযোগ্য সসম্ভ্রমে সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিদেশের ইতিহাস-লেখকেরা এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম নবাবের ভয়ে এতই জড়সড় হইয়াছিলেন যে, আবু তোরাপের মৃত্যুতে তিনি সাতিশয় শোকাকুল হইয়া নবাবের মনস্তুষ্টির জন্যই সমুচিত সমারোহে তাঁহাকে সমাধি দিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। *

আবু তোরাপের মৃত্যুতে মোগলের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সীতারাম অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল এ নিদারুণ অপমান নীরবে সহ্য করিবে না। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক তাঁহাকে যেরূপ ভীত ও আতঙ্কযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত

* When Sittaram found it was the Fouzdar he had slain, he much regretted the circumstance; and told his followers that the Nawab would certainly revenge the insult offered to his government, by flaying them alive, and by desolating the Pergunnah of Mahammedabad. He then respectfully delivered the body to the Fouzdar's attendants, who carried it to Bhoosnah, and interred it in the vicinity of that town.—*Stewart's History of Bengal.*

হইলে অবশ্যই সন্ধিসংস্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে করপ্রদান করিতে সম্মত হইলেই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত; রাজ্য থাকিত, রাজদুর্গ থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব ঘোষণা করিত; এবং হয় ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহ্নে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজ রাজা বা নিতান্তপক্ষে রায় বাহাদুর বলিয়া অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, একটু ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, একটু অধীনতাস্বীকার করিলে হাস্যময়ী রাজপুরী এমন শ্মশানভূমিতে পরিণত হইত না। যিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়া বাহুবলে সেই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি যে এতটুকুও বুঝিতেন না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না কেন? এই জন্যই মনে হয় যে, আত্মবংশ বা আত্মপরিবারকে ধনগৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্য সীতারাম ব্যাকুল হন নাই; বাহুবলে স্বাধীনরাজ্য গঠন করিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের ইতিহাস পড়িতে বসিলে ইহা ভিন্ন অন্য কোন অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এই সময় হইতে সীতারাম আত্মকার্য্যের পরিণাম-চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিণাম চিন্তা করিয়া অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কাল নিকট হইতেছে জানিয়াও, একদিনের জন্য মোগলের পদানত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমরা পরাধীন জাতি; আমাদের অস্থিমজ্জা অন্তঃসারশূন্য; আপাত-রম্য সুখস্বচ্ছন্দতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। আমাদের বিচারে সীতারামকে যদি আমরা অবিবেচক মূর্খ বলিয়া উপহাস করি, তাহাতে সীতারামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না! বঙ্কিমবাবু রাজমহিষী

রমার মুখ দিয়া আকারে ইঙ্গিতে সে কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। আমরা রমা-প্রকৃতি বাঙ্গালী পুরুষ, সীতারামের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে শিহরিয়া উঠিব, এবং বারংবার জিজ্ঞাসা করিব—এ সব কেন? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতারক্ষার জন্য এত নিষ্ফল প্রয়াস কেন?

স্বাধীনতাই যে মহত্ত্বের একমাত্র সোপান, এবং মহাপুরুষেরা যে কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাসে সীতারাম সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সেকালের বাঙ্গালী যদি সীতারামের সাধুদৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতে পারিত, তবে বাঙ্গালের প্রাণবিগলিত সোণার রাজ্য বিদেশের বণিক্‌সমিতি বিনা পণে কুড়াইয়া লইবার অবসর পাইত না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভূষণার অবরোধ।

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে মুর্শিদকুলী খাঁ সত্যসত্যই বিচলিত হইলেন। তিনি সীতারামের প্রবল প্রতাপে ভীত হইলেন না; তাঁহার মনে হইল যে, বাদশাহ তাঁহাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য

মনে করিয়া এখনই হয় ত আর তাঁহাকেও বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব করিয়া পাঠাইবেন। সুতরাং তিনি আর বিলম্ব করিতে সাহস করিলেন না। বক্স আলী খাঁ নামক একজন বিশ্বস্ত মুসলমানকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন, এবং যথারীতি দিল্লীর দরবারে সমাচার প্রদান করিলেন।

এক জন ফৌজদারের শূন্য পদে আর এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করা খুব সহজ কথা। ইঙ্গিতমাত্র অমাত্যবর্গ সনন্দ প্রস্তুত করিয়া আনিল; অবলীলাক্রমে তাহাতে নবাবের মোহর দস্তখত অঙ্কিত হইয়া গেল। কিন্তু সীতারামকে পরাজিত করিবার উপায় কি,—সে কথা তেমনই মীমাংসিত হইবার বিষয় নহে।

নাটোর রাজবংশের স্বনামখ্যাত রায় রাইয়ান রঘুনন্দন এই সময়ের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রভুত্বের অবধি ছিল না। রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ রামজীবনের প্রবল প্রতাপ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব অনন্যোপায় হইয়া রামজীবন ও রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন। সীতারামের রাজ্যের উত্তর এবং পশ্চিমে রামজীবনের বিস্তৃত জনপদ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সীতারামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা খুব সহজ। রঘুনন্দন প্রতিভাবলে সকলের নিকটই সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই প্রতিভা এখন সীতারামের সর্ব্বনাশসাধনকল্পে নিযুক্ত হইল। মন্ত্রণাকুশল রঘুনন্দন স্থির করিলেন যে চারিদিক্ হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা রহিত করিতে হইবে, এবং জমিদারী ফৌজ ও সুবাদারী সিপাই সম্মিলিত করিয়া ভূষণারাজ্য অবরোধ করিয়া ধীরে ধীরে সীতারামকে বশীভূত করিতে হইবে। যেমন পরামর্শ হইল, জমিদারদিগের উপর সেইরূপ আজ্ঞালিপি প্রচারিত হইল।

কেহই এই রাজাদেশ অবহেলা করিতে সাহস পাইল না ; সুতরাং পদ্মা, গৌরী, মধুমতী, জলঙ্গী প্রভৃতি নদীস্রোতের সঙ্গে যে সকল পণ্য-দ্রব্য সীতারামের রাজ্যে বাহিত হইত, তাহার সমাগম সহসা রহিত হইয়া গেল। চরমুখে এই সকল গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া সীতারাম বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঘটনাচক্রে নিতান্ত নিরীহস্বভাব ভাল মানুষকেও দুর্দান্ত করিয়া তুলে; সীতারামেরও তাহাই হইল। তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, বাণিজ্যদ্রব্য ও খাদ্য-সামগ্রীর আমদানী হইতেছে না, তখন আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলে খাদ্য-দ্রব্য লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করিতে হইল। যুদ্ধকলহে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করা দোষাবহ নহে। কিন্তু ইতিহাসলেখকগণ সকল সময়ে সে কথা স্মরণ করিতে চাহেন না। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম নৌকাপথে দেশ লুট করিয়া বেড়াইতেন; তিনি শুধু বিদ্রোহী নহেন, পরাক্রান্ত উৎপীড়নকারী দস্যু! *

যাহারা দিগ্বিজয়ী সেকন্দার বাদশাহ এবং দস্যুদলপতির উপকথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাদশাহ এবং দস্যুর মধ্যে বাদশাহই প্রকৃত দস্যু। সীতারাম দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু উদরান্নের জন্য, যানবাহনের জন্য, অথবা কেবল শত্রুপক্ষকে অপদস্থ ও হীনবল করিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতিমাত্রই সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

---

* Sitaram kept in his pay a band of robbers, with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers, and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Fouzder.—Stewart.

সীতারামের অত্যাচারে সুবাদারী সিপাহীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; সেনাহাতির প্রবল পরাক্রমে জলস্থল কম্পিত হইতে লাগিল; গ্রামে, নগরে, লোকালয়ে, নিবিড় বনে, নদীসৈকতে, সর্ব্বত্র খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে সকল কলহে সীতারামকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিল না।

নাটোর রাজবংশে দয়ারাম রায়* নামে একজন বিচক্ষণ প্রভুভক্ত সাহসী ও প্রতিভাসম্পন্ন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বাহুবলে ও পদগৌরবে নাটোরাধিপতি মহারাজাধিরাজ রামজীবন যেমন লোকসমাজে সুপ্রথিত; অসীম সাহসে ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে দয়ারাম রায়ও সেইরূপ সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। দয়ারাম নাটোর রাজসরকারের দক্ষিণবাহু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যখন সীতারামকে পরাজিত করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন দুই দিক হইতে দুই দল সেনা প্রেরিত হইল। সুবাদারী সিপাহীদিগের অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ এবং জমিদারী ফৌজের অধিনায়ক দয়ারাম রায়, যুগপৎ ভূষণা আক্রমণের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাস চিরদিনই একরূপ। বাঙ্গালীই চিরদিন বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী যদি স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্রও বদ্ধপরিকর হইত, সপ্তদশ অশ্বারোহীর অধিনায়ক ক্ষুদ্রোদর খর্ব্বদেহ মর্কটাকার বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপে পদার্পণ করিতে সাহস পাইতেন না! বাঙ্গালী যদি একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, আজ যাহারা রাজা, হয়ত তাঁহারা চিরদিনই বাণিজ্যব্যাপার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বাঙ্গালীর ধারাবাহিক ইতিহাস চিরদিনই একরূপ, চিরদিনই বাঙ্গালীর মন্ত্রণাকৌশলে অথবা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ বাহুবলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সীতারামেরও তাহাই হইল।

* অগ্রসিদ্ধ দিঘাপতিয়া রাজপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ।

দয়ারামের কৌশলে মেনাহাতি নিহত হইলেন। মেনাহাতির হত্যা-কাণ্ডে দেশের লোক শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাকে কেহ সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে সাহস পাইত না; সুতরাং সম্মুখযুদ্ধের আয়োজন হইল না। গুপ্তচরের সাহায্যে অল্প কয়েক জন লোক মহম্মদপুরে প্রবেশ করিয়া, সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সীতারাম ভূষণায় এবং মেনাহাতি মহম্মদপুরে সসৈন্যে রাজারক্ষা করিতেছিলেন। মেনাহাতি অতি প্রত্যুষে নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইতেন; সাহসী সেনাপতি সঙ্গে অনুচরমাত্র লইতেন না। সেই গুপ্তসংবাদ পাইয়া দয়ারামের অনুচরবর্গ একদিন প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া মেনাহাতিকে অন্যায় কৌশলে শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মেনাহাতির জীবন ও মৃত্যু অনেক অলৌকিক কিংবদন্তীতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। লোকে বলে যে, মেনাহাতি শূলবিদ্ধ হইয়াও মরিলেন না; জর্জ্জরিতদেহ রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি প্রাণবায়ু বাহির হইল না। অবশেষে তিনি আর অনর্থক যন্ত্রণাবহন করা অনাবশ্যক বলিয়া, আপন মৃত্যুসন্ধান বলিয়া দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

মেনাহাতি নিহত হইল, কিন্তু মহম্মদপুর হস্তগত হইল না। গুপ্তচরগণ রাজরোষ উদ্দীপ্ত করিয়া গোপনে নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িল; সীতারাম এই সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং যথোচিত সমারোহে মেনাহাতির কবন্ধদেহের সৎকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জমিদারী ফৌজের অধিনায়ক মেনাহাতির ছিন্নমুণ্ড লইয়া নবাবদরবারে উপনীত হইলেন। সে বীরমস্তক যেন ভীমের মস্তক। নবাব তাহা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, হায়! হায়! এমন মহাবীরকে হত্যা করা হইল কেন?

ইহাকে সশরীরে কারারুদ্ধ না করিয়া গুপ্তভাবে নিহত করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে।* তিনি সসম্ভ্রমে সীতারামের নিকট সে বীরমুণ্ড উপহার পাঠাইয়া দিলেন। মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সেই বীরমুণ্ড সমাহিত রহিয়াছে; সীতারাম তাহার উপর যে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

মেনাহাতিই সীতারামের দক্ষিণবাহু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেনাহাতি নিহত হইলে সীতারামের আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। চারি দিক হইতে নবাবের ফৌজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কালক্রমে সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

* It is narrated that his head was sent to the Nawab at Moorshedabad and that the Nawab, seeing the huge head, said,—"A man like that you should have brought alive and not killed." He directed the head to be taken back to Muhammedpore, and it was there buried, and a great tomb raised over it. The spot marked by the brick formation of the tomb is still shown, close to the north-east corner of the present bazar.—J. Westland.

মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে, বক্স আলী খাঁ সীতারামকে ও তাঁহার পরিবারস্থ সমুদায় নরনারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে চালান দিয়াছিলেন; নবাব সীতারামের স্ত্রীপুত্রদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া সীতারামকে শূলদণ্ডে নিহত করেন, এবং সগৌরবে দিল্লীতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করেন। *

মুসলমানদিগের এই কাহিনী ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রাজসাহী প্রদেশে আজিও সীতারামের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; এ দেশের লোকেও মুসলমানদিগের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। নলডাঙ্গার রাজসরকার হইতে সীতারামের স্ত্রীপুত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃত্তিলাভ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ বা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করার বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দিল্লীর দরবারে খাতির পাইবার জন্য নবাব বাহাদুর যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসলেখকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সীতারাম শূলদণ্ডে নিহত হইলে অবশ্যই তাহার জনশ্রুতি বর্ত্তমান থাকিত।

ভূষণারাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বিজয়োন্মত্ত জমিদারী ফৌজ মহম্মদপুর লুঠিয়া লইল। দয়ারাম রায় এই অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নবাব দরবার হইতে "রায় রাইয়ান্" উপাধি লাভ করিলেন। † সীতারামের সুবিস্তৃত রাজ্য মহারাজ রামজীবনের রাজসাহী-রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। নবাব

* These proceedings were entered in the public records; and the Governor wrote a particular representation of all the circumstances to the Emperor, placing his own conduct in the most favorable point of view.—Stewart.

† The Rajas of Rajshahi.

মুর্শিদ কুলী যেরূপ ভাবে বিজয়ে

কেন, মহারাজ রামজীবনের সনন্দে কিন্তু ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কেবল ইহাই লিখিত আছে যে, অন্য লোকে ভূষণা

পরিমাণ রাজকর দিতে চাহিল, রামজীবন তদপেক্ষা অধিক রাজকর

করায়, চা জমিদারীভুক্ত করা হইল।

ভূষণা রাজসাহী-রাজ্য ভুক্ত হইয়া গেল। দয়ারাম তাড়াতাড়ি আপন বাটী দিঘাপতিয়াতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে অনেকেই সন্দেহ

লুঠের মূল্যবান সম্পত্তি

নাটোর কুমার

সন্ধান লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

তাহাতে সংবাদ সুচতুর দয়ারাম

বিদ্রোহদলন

দয়ের কপর্দকও স্পর্শ করিতে সাহস করেন

সীতারামের র অজ্ঞাত

রাখিয়াছিলেন

অবশ্যই সমাগত দ্রব্যে লোভ না করিয়া কেবল সীতারামের বিগ্রহ কৃষ্ণজীকে সসম্মানে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে আজিও দয়ারামের রে যথোচিত সমারোহে কৃষ্ণজীব পূজা হইতেছে।

কেবল কৃষ্ণজীর পাদপদ্মে ক্ষোদিত আছে—দয়ারাম বাহাদুর।

সীতারামের কি

সতার আকাশকুসুম শুকাইয়া গেল, তথাপি জীবন গেল না। তাঁহাকে

গাইয়া বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিয়া মুর্শিদাবাদ-কারাগারে জীবনলীলা বিসর্জ্জন করিলেন। *

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই কাহিনীকেই সত্য কাহিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহীর লোকের ধারণা অন্যরূপ। নাটোর রাজবাটীতে এখনও একটি জরাজীর্ণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুরা[illegible] আছে; লোকে বলে, সেখানেই সীতারাম বন্দিদশায় প্রাণবিসর্জ্জন করেন। নবাব যাঁহার প্রবলপ্রতাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মোগল-সেনাপতি আবু তোরাপ যাঁহার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ধরিবার জন্য এত কৌশল, এত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, সেই সীতারাম বন্দী হইবামাত্র নবাব যে তাঁহার আর কোন তত্ত্ব না লইয়া নাটোর রাজ-কারাগারে বাস করিবার অবসর দিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নাটোর রাজবাটীতে জনরব বড়ই প্রবল;— এখনও নাকি পুরাতন ভৃত্যবর্গ অন্ধকার নিশীথসময়ে সেই জরাজীর্ণ কারাকক্ষে সীতারামের প্রেতাত্মার বিকট চীৎকার শুনিয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় যে, স্বয়ং দয়ারাম যখন সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণজী বিগ্রহ কুক্ষিগত করিয়া দিঘাপতিয়ায় গমন করিবার সময়ে সীতারামকে কয়েক দিনের জন্য নাটোর-রাজকারাগারে অবরুদ্ধ রাখিয়া অবশেষে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রামজীবন এবং রঘুনন্দনের অধ্যবসায়ে সীতারামের রাজধানী শ্মশান হইয়াছিল। সে শ্মশানভূমি সম্মার্জ্জন করিয়া আবার তাহার উপর আর একজন বিচিত্র রাজধানী গঠন করিয়া সযত্নরচিত দেবমন্দির সুসজ্জিত করিয়া মহোৎসবে মহম্মদপুরের রাজপথ শঙ্খঘণ্টারবে প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে সকল দেবমন্দির আবার ধীরে ধীরে

বনজঙ্গলে লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে। যিনি সীতারামের শ্মশানপুরীকে আবার সযত্নে সুসজ্জিত করিয়া দেবীপূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। রাণী ভবানীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের বীরকীর্ত্তি ক্রমেই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। মহম্মদপুর এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সে মহম্মদপুর আর নাই, তাহা এখন আবার শ্মশান।

সমাপ্ত।